এই সূর্যোদয়ের রং গৈরিক
— পৃঃ ১২

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিকরণের সহায়ক রাজশক্তি
— পৃঃ ১৯

৬৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা।। ৩ এপ্রিল ২০১৭।। ২০ চৈত্র - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৭২.৪৭ শতাংশ।	২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৫.২৫ শতাংশ।
২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা হয়েছে ৭০.৫৪ শতাংশ।	২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা হয়েছে ২৭.০১ শতাংশ।
১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা কমেছে ১.৯৩ শতাংশ।	১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে ১.৭৬ শতাংশ।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের বৃদ্ধির হার তাদের জাতীয় গড় বৃদ্ধির দ্বিগুণ।

সূত্র : পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় জনগণনা রিপোর্ট

ইসলামিকরণের পথে পশ্চিমবঙ্গ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৩০ সংখ্যা, ২০ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩ এপ্রিল - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

রাজ্যে লোকসভা ভোটে লড়াইটা হবে বিজেপি বনাম তৃণমূল
□ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : ত্রিশূলে ‘কন্ডোম’ পরানো সহজ কাজ নয়
□ সুন্দর মৌলিক □ ১১

এই সূর্যোদয়ের রং গৈরিক □ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ১২

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান জেহাদি কর্মকাণ্ড জাতীয় স্বার্থের পক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ : আর এস এস □ ১৪

উত্তেজক ভাষণে চিকিৎসা ব্যবস্থার অসুখ সারবে না
□ সাধন কুমার পাল □ ১৬

পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিকরণের সহায় রাজশক্তি
□ মোহিত রায় □ ১৯

ইসলামিকরণের পথে পশ্চিমবঙ্গ
□ অমলেশ মিশ্র □ ২২

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে মুসলমান সমাজকে
□ রামিশ সিদ্দিকি □ ২৭

রামনবমী ও শ্রীরামজন্মভূমি □ রূপশ্রী দত্ত □ ৩১

এই রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র : ডা: হেডগেওয়ার
□ প্রণয় রায় □ ৩২

নিয়মিত বিভাগ

সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ □ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ □ অঙ্গনা : ৩৪ □ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ □ অন্যরকম : ৩৬ □ খেলা : ৩৭ □ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ □ শব্দরূপ : ৪০ □ চিত্রকথা : ৪১□ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রামজন্মভূমি

সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন রামজন্মভূমিকে নিয়ে বিবাদাস্পদ দুই পক্ষকে আদালতের বাইরে আপোশে মীমাংসা করার কথা বলেছেন প্রধান বিচারপতি। শীর্ষ আদালতের অনুরোধকে সবপক্ষ সম্মান জানিয়েছেন। ফলে রামজন্মভূমির বিষয়টি একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। বিশেষত, উত্তরপ্রদেশে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়লাভের পরিপ্রেক্ষিতে। আগামী সংখ্যায় বিষয়টির উপর আলোকপাত করবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

নববর্ষ সংখ্যা

স্বস্তিকা

পশ্চিমবঙ্গে
হিন্দুর ভবিষ্যৎ

আগামী ১৭ এপ্রিল প্রকাশিত হবে

মূল্য একই থাকছে— ১০ টাকা

সত্বর কপি বুক করুন

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আধার কার্ডের ব্যবহার

ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন যে সুপ্রিম কোর্ট একদিকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চালু, প্যান কার্ড ইস্যু, আয়কর রিটার্নের মতো বিষয়গুলিতে আধার কার্ডের (ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া) ব্যবহার সঠিক বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, আবার অন্যদিকে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে তাহা আবশ্যিক করা যাইবে না বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সম্প্রতি প্রায় ৩৬টি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পে ১২ ডিজিটের আধার নম্বর বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। সেইসঙ্গে এই কথাও বলা হইয়াছে ৩০ জুনের মধ্যে সবাইকে এই বায়োমেট্রিক পরিচয়পত্র দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। যদি সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মতো সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে আধার কার্ডের ব্যবহার ঐচ্ছিক হইয়া যায়, তবে কিছু লোক এই ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে চাহিবে আর ইহার ফলে সরকারি ধনবন্টনের বিষয়টি ধাক্কা খাইবে। আজ ইহা প্রায় সকলেরই জানা যে ভরতুকি দেওয়ার ক্ষেত্রে আধার কার্ডের ব্যবহারের ফলে কোটি কোটি টাকার সাশ্রয় হইয়াছে। কেননা আধার কার্ড ব্যবহারের ফলে ধান্ধাবাজ লোকেরা আর ভরতুকির সুযোগ পাইতেছে না। কেবল যোগ্য লোকেরাই সরকারি সাহায্য পাইবে। যখন সরকারের তরফে বারবার আশ্বাস দেওয়া হইতেছে যে যতক্ষণ সবাই আধার কার্ড না পাইতেছেন ততক্ষণ আধার কার্ডের ব্যবহার আবশ্যিক করা হইবে না। ইহার অর্থ—দেশের সকল নাগরিকেরই আধার কার্ড সরকার সুনিশ্চিত করিতে চায়। বস্তুত আধার কার্ড যাহারা এখনও পায় নাই তাহারাও কিন্তু সরকারি সাহায্য পাইতেছে। আধার কার্ড কোনো বাধা হইয়া উঠে নাই। ইহা বোঝা যায় যে আধার কার্ড না পাইলে সরকারি সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে—এই আশঙ্কায় দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষরা চিন্তিত। কিন্তু সম্পন্ন ও শিক্ষিত মানুষরা কেন ইহার বিরোধিতা করিতেছেন তাহা বোঝা কঠিন। বিরোধিতাকারীদের আশঙ্কা, মৌলিক অধিকারে অন্তর্গত ব্যক্তিগত তথ্যাবলী তথা গোপনীয়তা ইহাতে প্রকাশ হইয়া যাইতে পারে। বিশেষত ব্যক্তিগত তথ্য গ্রহণ হইতে বায়োমেট্রিক পরিচিতি সংগ্রহ করিয়া আধার কার্ড ইস্যু করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে যখন বেসরকারি সংস্থাগুলিকে। এই ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া সরকার নাগরিকদের উপর নজরদারি চালাইতে পারে বলিয়াও তাহারা অভিযোগ করিয়াছেন।

এইসব দেখিয়া মনে হইতেছে বিরোধী দলের নেতারা বিশেষত কংগ্রেস ইহা কিছুতেই হজম করিতে পারিতেছে না যে তাহাদেরই প্রচলিত আধার কার্ড মোদী সরকার আরও উন্নত উপায়ে ব্যবহার করিতেছে। ইহা অবশ্য আমাদের দেশে নতুন নহে যে একই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলি যখন সরকার পক্ষে থাকে তখন এরকম এবং বিরোধী পক্ষে থাকিলে অন্যরকম অভিমত পোষণ করে। তাই সুপ্রিম কোর্টের কাছে অনুরোধ করা যায় যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আধার কার্ডের ঐচ্ছিক ব্যবহারের বিষয়টি লইয়া নতুন ভাবে ভাবনা-চিন্তা করিতে পারেন। ঘটনা হইল, কোনো প্রকল্পে ঐচ্ছিক বিষয়টির অর্থ যথাস্থিতি বজায় রাখা। যখন এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে দেশের কোটি কোটি মানুষ আধার কার্ডের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের টাকা সঠিকভাবে পাইতেছেন, তখন শীর্ষ আদালত এই কার্ডের ব্যবহারকে ঐচ্ছিক করিতে বলিতেছেন। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিলে ভালো হয়। বিভিন্ন পরিষেবা ও প্রকল্পে আধার কার্ডের ব্যবহার আজ সময়ের দাবি। এই দাবি পূরণের জন্য আধার কার্ডকে ঐচ্ছিক ব্যবহার হিসেবে দেখিলে চলিবে না।

সুভাষিতম্

বিনা প্রীতিং বিনা নীতিং বিনা সৎকার্যপদ্ধতিম্।

বিনা কর্তৃত্বশক্তিং চ সঙ্ঘোনৈব বিবর্ধতে।।

প্রেম ছাড়া, নৈতিকতা ছাড়া, সৎ কার্যপদ্ধতি ও কর্তৃত্বশক্তি ছাড়া সংগঠনের কাজ বৃদ্ধি হয় না।

পঞ্চাশ উপাচার্যের উপস্থিতিতে জ্ঞানসঙ্গম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ বিকশিত করা জরুরি। শিক্ষায় ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞান পরম্পরা এবং সংস্কৃতি বিকাশের দৃষ্টিতে এই সঙ্গম কোনো বিকল্প মাত্র নয়, বরং সঠিক দিশার দিকে প্রকৃত প্রয়াস। ভারতের প্রাচীন জ্ঞান পরম্পরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। শিক্ষায়

ভারতীয় দৃষ্টিকোণ বিষয়ে গত ২৫-২৬ মার্চ দিল্লিতে 'জ্ঞানসঙ্গম' নামে দু'দিনের এক আলোচনা সভার সমাপ্তি অধিবেশনে একথা বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। জ্ঞানসঙ্গমের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শিক্ষাবিদ দীননাথ বত্রা বলেন, এই সঙ্গম সব দিক থেকেই সফল। এই প্রথম সারাদেশ থেকে ৭০০ জনেরও বেশি শিক্ষাবিদ এমন একটি সম্মেলনে যোগদান করেছেন যাঁরা নিজেদের খরচেই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ৫০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষা ঔপনিবেশিক ভাব-ভাবনা থেকে মুক্ত নয় এবং শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় উপকরণ ও পরিভাষা কীভাবে ব্যবহার করা যায়— এইসব বিষয়ে চর্চা হয়েছে। প্রজ্ঞা প্রবাহের এক প্রেস রিলিজে শ্রীভাগবতের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে— শিক্ষাবিদদেরও নিজের নিজের রাজ্যে একইরকম প্রচেষ্টা করা উচিত যাতে তাঁদের বিষয়গুলিতে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ বিকশিত হয়। জ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতের গৌরবময় অতীতের কী ভূমিকা ছিল তা ছাত্রছাত্রীদের জানা প্রয়োজন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী। অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য জি সি ত্রিপাঠি, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ হিস্টোরিক্যাল রিসার্চের চেয়ারম্যান ওয়াই সুদর্শন রাও প্রমুখ।

জম্মু ও কাশ্মীরে সংখ্যালঘু কারা, জানতে চাইল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জম্মু ও কাশ্মীরে বসবাসকারী প্রকৃত সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণের কাজ কেন্দ্র ও রাজ্য

প্রধান বিচারপতি কেহর

বিচারপতি চন্দ্রচূড়

বিচারপতি কাউল

সরকার যৌথভাবে করার সিদ্ধান্ত নিল। সম্প্রতি প্রধান বিচারপতি জে. এস. কেহর এবং অপর দুই বিচারপতি ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড় ও সঞ্জয় কিষেণ কাউলকে নিয়ে গঠিত যৌথ বেঞ্চ উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে একটি মামলার রায় ঘোষণা করে বলেন, 'রাজ্য এবং কেন্দ্র একসঙ্গে বসে জম্মু ও কাশ্মীরে সংখ্যালঘুরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার সমাধান করতে রাজি হয়েছে। তদন্তের পর তারা একটি যৌথ প্রস্তাব দেবে। আদালত এই সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি চায়।'

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে অঙ্কুর শর্মা একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার সংখ্যালঘু উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ টাকা রাজ্যের প্রকৃত সংখ্যালঘুদের জন্য খরচ না করে মুসলমানদের জন্য খরচ করছে। সারাদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হলেও কাশ্মীরে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অঙ্কুর শর্মার আর একটি অভিযোগ ছিল, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার রাজ্যের প্রকৃত সংখ্যালঘু চিহ্নিতকরণের কাজ এখনও পর্যন্ত শুরু করেনি।

জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি আইনজীবী গোপাল সুব্রাহ্মনিয়াম আদালতকে জানান তিনি রাজ্য সরকারকে সাচার কমিটির (ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কিত) নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'সরকার এখনও পর্যন্ত আমার পরামর্শ মেনে চলেছে।' আদালত তার জবাবে বলে, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্যে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতি যেভাবে দিন-দিন খারাপ হচ্ছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসব মাথায় রাখা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার তাদের না দেখলে আর কে দেখবে!'

বাবরের নামে কোনো মসজিদ নয় : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশ্ব হিন্দু পরিষদ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে ভারতের কোথাও বাবরের নামে কোনো মসজিদ বানানো যাবে না। সম্প্রতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুবশাখা বজরং দলের আহ্বায়ক বলরাজ দুঙ্গার বলেন, 'আমরা ভারতের কোথাও বাবরের নামে মসজিদ বানাতে দেব না। বাবর কোনো মুসলমান সন্ত নন যে তার নামে মসজিদ থাকতে হবে। বাবর সারাজীবন লুটপাট করেছে আর জোর করে এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করেছে। আমরা মুসলমানদের বিরোধী নই। তারা অযোধ্যার ৮৪ ক্রোশী পরিক্রমার বাইরে যে-কোনো জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করতে পারে কিন্তু বাবরের নামে নাম রাখা যাবে না।'

বলরাজ দুঙ্গার জানান, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রামোৎসব সঙ্কল্প সভা শুরু হয়ে গেছে। ভারতের সর্বত্র সভা হবে। এই সভার উদ্দেশ্য হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্ট বাবরি মসজিদ বিতর্ক আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখপাত্র শীলেন্দ্র চৌহান বলেন, 'আমরা আদালতের বাইরে সমস্যার সমাধান করার জন্য প্রস্তুত কিন্তু অন্যপক্ষ রাজি হবে না। আমরা নতুন করে বারবি মসজিদ বানাতে দেব না। অযোধ্যার ৮৪-ক্রোশী পরিক্রমার বাইরে যেখানে খুশি মসজিদ বানাক আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা শুধু চাই গুজরাটে সোমনাথ মন্দির নির্মাণের সময় যেরকম সংসদে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল রামমন্দিরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হোক।' পরিষদের মেরঠ মহানগরের সম্পাদক গোপাল শর্মা বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যেই অর্থসংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছি। কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। আইন পাশ হয়ে গেল মন্দির বানাতে বেশি সময় লাগবে না।'

রামমন্দির হবে : সামনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রামমন্দির হবে। তবে সেটা সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের ফলে নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে। সম্প্রতি এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে শিবসেনার মুখপত্র সামনায়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছে,

'আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যা বলেন সারা দেশ তা শোনে। সাধারণভাবে মনে হয় মুসলমানরাও প্রধানমন্ত্রীর কথায় গুরুত্ব দেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন তাঁর প্রশাসন রাজ্য থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদভাব দূর করবেন। সুতরাং মুসলমানদের এখন গোঁয়ার্তুমি ছেড়ে রামমন্দির নির্মাণে সহায়তা করা উচিত।'

দেশের উন্নতিতে মাওবাদীদের বাধা হতে দেব না : রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ বলেছেন দেশের উন্নতিতে মাওবাদীদের বাধা সরকার কড়া হাতে দমন করবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তকে পিছিয়ে রাখার যে মাওবাদী-প্রয়াস তাও সফল হতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনীর কঠোর মনোভাবের ফলে মাওবাদীরা এখন খুবই অস্থির। সাম্প্রতিক সুকমা-আক্রমণ হতাশারই ফল। মাওবাদী আক্রমণে নিহত পুলিশকর্মীদের সহানুভূতি প্রদর্শন করে তিনি বলেন, 'বর্বরদের আক্রমণে যারা মারা গেছেন আমি তাদের প্রত্যেকের পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি

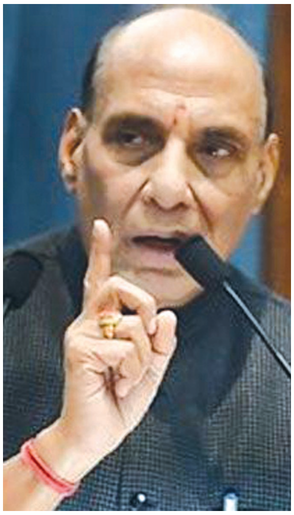

স্পষ্ট করে বলতে চাই সারাদেশ তাদের পাশে আছে। সাধারণ মানুষকে সরকারের উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরিয়ে রাখার সুযোগ মাওবাদীদের দেওয়া হবে না।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ২০১৬ সালে মাওবাদীরা অভূতপূর্ব ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে। একথা তারা স্বীকারও করেছে তাদের নানা পত্রপত্রিকায়। ২০১৬ সালে সারাদেশের মাওবাদী- অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে ১৩৫ জন মাওবাদী যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ৭৭৯ জন। আত্মসমর্পণ করেছে ১১৯৮ জন। ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যেও মাওবাদী হামলা ১৫ শতাংশ কমেছে। ২০১৫ সালে হামলা হয়েছিল ৪৬৬টি। ২০১৬-তে সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ৩৯৫।

রাজনাথ সিংহ বাহিনীর জওয়ানদের অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ভবিষ্যতে বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি যাতে কমানো যায় তার নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

জে এন ইউ-নিখোঁজের আই এস যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখোঁজ ছাত্র নাজিব আহমেদের আই এস যোগের সূত্র ধরে ক্রমেই চড়ছে রাজনীতির পারদ। গত ২১ মার্চ একটি ইংরেজি সর্বভারতীয় দৈনিকে দিল্লি পুলিশের বিভিন্ন গোপনীয় সূত্র উদ্ধৃত করে নিখোঁজ নাজিব যে

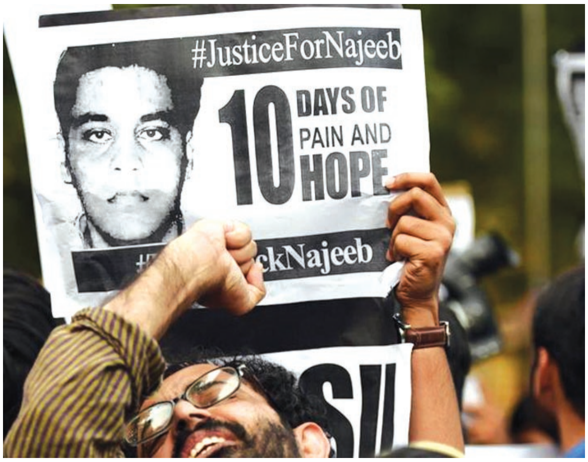

জঙ্গি সংগঠন আই এস আই এসের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল তা দেখানো হয়েছিল। প্রতিবেদনে এও বলা হয়েছিল যে নাজিব ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য, উইকিপিডিয়া ইত্যাদিতে আই এস-এর ব্যাপারে অনুসন্ধান করছিল। ইউটিউবে আই এস নেতাদের ভাষণ অবধি সে শুনেছিল। আই এস-এ যোগ দিতে গেলে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় এ ব্যাপারেও সে খোঁজ নিচ্ছিল বলে প্রতিবেদনে প্রকাশ। যদিও বিষয়টি স্পর্শকাতর বলে প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় দিল্লি পুলিশ প্রথমে মুখ খুলতে চায়নি। পরে এরকম কোনো খবর নেই বলে রুটিন বক্তব্যে জানিয়েছে।

কিন্তু এই খবরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দেশ জুড়ে। দিল্লি হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই নিখোঁজ নাজিবের ব্যাপারে তথ্য জমা দিয়েছে দিল্লি পুলিশ। গত ১৪ অক্টোবর এবিভিপি-কর্মীদের সঙ্গে ঝামেলার আগে সে এক আই এস নেতার ভিডিও ভাষণ শুনে এসেছিল বলে অভিযোগ। ঝামেলার পরদিন সে নিখোঁজ হওয়ার আগে একটি অটোরিক্সায় তাকে দেখার ছবি সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে বলে সূত্রের খবর। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে নাজিব 'অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারে' ভুগছে এবং ডিপ্রেসন বা অবসাদ কাটানোর জন্য সে রীতিমতো ওষুধ নেয়।

দিল্লি পুলিশ যদিও এখনও পর্যন্ত নাজিবের আই এস যোগের বিষয়টি তারা অবহিত নয় বলে জানিয়েছে কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করছে মুসলমান যুবকদের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে আই এস বা অন্য উগ্রপন্থী সংগঠনে যোগ দেওয়ার নজির ভুরি ভুরি রয়েছে। দ্বিতীয়ত, জে এন ইউ-কে ভারত-বিরোধী শক্তি যে ক্রমশ তাদের পরীক্ষাগারে পরিণত করছে স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে, গোয়েন্দাদের কাছে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যও রয়েছে। তবে নাজিবের এই সংবাদে সবচেয়ে মুষড়ে পড়েছে সেকুলার ও মাওবাদী-মার্কসবাদী গোষ্ঠী। যারা রটিয়েছিল বিদ্যার্থী পরিষদ নাজিবকে গুম করেছে, এখন নাজিবের আই এস যোগের সংবাদে তারা প্রতিক্রিয়াবিহীন। যদিও গণতন্ত্রে আই এসে যোগ দেওয়াটা এমনকী দোষের— এই প্রতিক্রিয়া তাদের পক্ষ থেকে আসতে বিশেষ দেরি হবে না বলেই মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদ বিরোধী সচেতনতা যাত্রা

মূলে আঘাত করলে তবেই মাওবাদ শেষ হবে : স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'এখনকার মাওবাদী বা তাদের পূর্বসূরি নকশালদের শেকড় বিদেশে। আমরা যদি সত্যিই এই বিভীষিকার শেষ দেখতে চাই তাহলে ওই শেকড়ে আঘাত করতে হবে।' ফোরাম ফর অ্যাওয়ারনেস অব ন্যাশনাল সিকিউরিটি (ফ্যানস), ছত্তিশগড়, আয়োজিত তিন দিনের সচেতনতা যাত্রায় একথা বলেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি মহারাজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের মধ্যে ছত্তিশগড় হলো সর্বাপেক্ষা মাওবাদী-অধ্যুষিত রাজ্য। সেখানে মাওবাদ বিরোধী এই সচেতনতা মাত্রা উল্লেখের দাবি রাখে।

সিরহাসর ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি ভারতের সব রাজ্য থেকে মাওবাদকে উৎখাত করার ডাক দেন। তিনি বলেন, মাওবাদ আইন-শৃঙ্খলাজনিত কোনো বিষয় নয়। বস্তুত এটি সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ। তাই এই সমস্যার সমাধান প্রতিটি মাওবাদী-অধ্যুষিত রাজ্যকে পাশে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্তরে খুঁজতে হবে। মাওবাদীদের রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসদের সঙ্গে তুলনা করে স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি বলেন, শ্রীরাম যখন এই অঞ্চলে আসেন তখন এখানকার মানুষ রাক্ষসদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। সকলেই জানেন, শ্রীরাম সেইসব মানুষকে সঙ্গে নিয়ে রাক্ষসদের মেরে সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে মাওবাদীদের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যেও সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ও ফ্যানসের উপদেষ্টা ইন্দ্রেশকুমার সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, 'মাওবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ আমাদের দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারলে তবেই ভারত থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে।'

৮৪-র শিখ নিধন : ১৯৯টি মামলার পুনঃ তদন্তের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশেষ তদন্তকারী দল সিট কিছুদিন আগেই তদন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, ১৯৮৪ সালে শিখ-বিরোধী দাঙ্গার ১৯৯টি মামলার পুনঃ তদন্ত প্রয়োজন। দেহরক্ষীদের গুলিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পর সারাদেশে দাঙ্গায় ২৮০০ শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষকে হত্যা করা হয়। দাঙ্গায় ইন্ধন দেবার অভিযোগে নাম জড়িয়েছিল বহু কংগ্রেস নেতার। সন্দেহ নেই সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশের ফলে শতাব্দীপ্রাচীন দলটি আরও বিপদে পড়ল। উল্লেখ্য, বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বাধীন যৌথ বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে ১৯৯টি মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে। সিটের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে অ্যাটর্নি জেনারেল মুকুল রোহতাগি জানান, মোট ২৯৩টি মামলার শুনানি হয়েছে। যার মধ্যে ১৯৯টি মামলা প্রমাণের অভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দিল্লি শিখ গুরুদ্বারা ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য এস গুরলাদ সিংহ কাহ্‌লনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের এই নির্দেশ। বিচারপ্রক্রিয়া আরও দ্রুততর করে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদনকারী আদালতকে অনুরোধ করেছেন। আদালত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে ছ'মাসের মধ্যে তদন্তের কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা দেবার নির্দেশ দিয়েছে।

উবাচ

“আমরা এমন একটা দেশের মানুষ যারা নিজেদের মতামতকে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাস করে না।”

ব্রহ্মকুমারীর ৮০তম বার্ষিক সম্মেলনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে।

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

“গিলগিট-বালটিস্তান ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের বৈধ সাংবিধানিক অংশ। ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানি বেআইনিভাবে তা অধিগ্রহণ করে রেখেছে।”

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ২৩ মার্চ ২০১৭ গৃহীত এক প্রস্তাব গিলগিট-বালটিস্তানকে পাকিস্তানের পঞ্চম প্রদেশ হিসাবে ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে

“সন্ত্রাসের থেকে বেশি অন্য কোনো কিছু বিশ্বায়ন হয়নি। কিন্তু এর প্রতিবাদ বরাবরই খুব কৌশলী, তাই এখনও খুবই সীমিত।”

সন্ত্রাস প্রতিরোধ প্রসঙ্গে।

এস জয়শঙ্কর
বিদেশ সচিব, ভারত

“বাচ্চাদের যেটুকু হুঁশ থাকে আপনাদের কি সেটুকুও নেই! আমি জানতে চাই কি হচ্ছে? এটা কি স্কুল?”

লোকসভা হৈ-হট্টগোল প্রসঙ্গে।

সুমিত্রা মহাজন
স্পিকার, লোকসভা

“আমি একজন সামান্য কর্মচারী মাত্র; আমাকে তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছিল। তাদের দেওয়ার আগে আমি কখনও টাকার বান্ডিলটা (ক্যাশ প্যাকেট) খুলিনি।”

নারদা তদন্তকারী সিবিআই অফিসারদের কাছে।

ম্যাথু স্যামুয়েল

রাজ্যে লোকসভা ভোটে লড়াইটা হবে বিজেপি বনাম তৃণমূল

নারদকাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে তৃণমূলের বড় বড় রুই কাতলা উঠবে বলে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা ভুল করবেন। আমাদের রাজ্যের বড়দিদি তাঁর ভাই বোনেদের বলেছেন তিনি সব ম্যানেজ করে দেবেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনের সময় মহাজোটের 'জুজু' সামনে ধরে নারদ, সারদা, রোজভ্যালি ইত্যাদি দুর্নীতিতে জড়িত দলের রাঘব বোয়ালদের জেলযাত্রা থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। তবে বড়দিদির কথায় ভরসা করা ভুল হবে। তিনি সুদীপ, তাপস, মদন কারুরই জেলযাত্রা আটকাতে পারেননি। নারদকাণ্ডে সিবিআই তদন্ত আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তিনি নিজের মুখ পুড়িয়েছেন। দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট যে স্থগিতাদেশ দেয় না এই সাধারণ সত্যটা বড়দিদির জানা ছিল না। এখন বলছেন উকিলবাবুরা তাঁকে ডুবিয়েছেন। বড়দিদির মাথায় টুপি পরিয়ে লাখ লাখ টাকা তাঁর পেটোয়া উকিলবাবুরা পকেটে পুরেছেন।

বড়দিদি একসময় বলতেন নারদ দুর্নীতির হুল ফোটানোর কাজটা করেছিল বিজেপি। সবই বিজেপির রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাতে তিনি কলকাতা পুলিশকে তদন্ত করার দায়িত্বে এনেছেন। এর আগে তাঁর দলদাস পুলিশ কর্তারা তদন্তের নামে সারদার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট করেছে। নারদের ক্ষেত্রেও সেই একই পরিকল্পনা ছিল। বড়দিদির মতলবটা বুঝেই কলকাতা হাইকোর্ট কলকাতা পুলিশের মাথার উপর কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইকে বসিয়েছে। একদা দিদি বলেছিলেন, নারদকাণ্ড কলকাতা পুলিশকে তদন্ত করতে বলেছেন, কারণ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে। আমাদের এই বড়দিদি সদা সত্য কথাই বলেন। তাই বাস্তবে দেখা গেছে তাঁর দলের মধ্যেই বিষধর সাপ লুকিয়েছিল। তৃণমূল দলের রাজ্যসভার সাংসদ কে ডি সিং তাঁর অ্যালকেমিস্ট চিটফান্ডের টাকায় নারদ স্টিং অপারেশন চালিয়েছিলেন খোদ বড়দিদিকে ফাঁসাতে। বড়দিদির বদ্ধমূল বিশ্বাস, কে ডি সিংকে মদত দিয়েছেন দলেরই নেতা মুকুল রায়। বড়দিদির একটা মস্ত সুবিধা আছে যে

গূঢ় পুরুষের কলম

কাউকে দোষী বলতে তাঁর প্রমাণের দরকার হয় না। তিনি এক টিভি সাক্ষাৎকারে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁকে সরাতে দলের মধ্যে কিছু বড় নেতা ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

জানা গেছে, গত বছর মার্চ মাসে নারদা কাণ্ডের যে ফুটেজ টিভিতে রাজ্যবাসী দেখেছিলেন তা আদতে অতি সামান্য অংশ। সিবিআই নারদকাণ্ডের আরও ১৭৬ মিনিটের ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। এই ফুটেজে আছে তৃণমূল বিধায়ক মন্ত্রীরা দলের নেত্রী এবং তাঁর পরিবার সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। কার্যত, দলের আর্থিক দুর্নীতির কথা উজাড় করে বলেছেন তাঁরা। তাঁদের বয়ান থেকেই সামনে এসেছে কীভাবে সারদা-রোজভ্যালির মতো একাধিক চিটফাণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তৃণমূলের ওজনদার নেতানেত্রীদের। মোট আটজন অসাধু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে তাদের কী কী সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল তার খুঁটিনাটি তথ্য গোপন ক্যামেরার সামনে বলেছিলেন তৃণমূল নেতারা। এইসব স্বীকারোক্তির ফাঁদ থেকে বড়দিদির ভাইদের বেরিয়ে আসাটা প্রায় অসম্ভব।

লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিকে আটকাতে বিরোধীদের মহাজোট করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সোনিয়া গান্ধী-রাহুল গান্ধীরা চাইছেন সেই মহাজোটের নেত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার আপত্তি নেই। কারণ, তাঁর দলকে সিবিআইয়ের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে পালের নেতা হওয়া প্রয়োজন। যত দলভারী হবে ততই চাপ সৃষ্টি করাটা সহজ হবে। কংগ্রেস যে সারদা, নারদাকাণ্ড থেকে তৃণমূলকে বাঁচাতে চাইছে তার প্রমাণ কপিল সিব্বল, মনু সিংভিদের সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করাটা দেখে। বিধানসভায় বিরোধী দলের কংগ্রেস নেতা আবদুল মান্নান স্বীকার করেছেন, সিব্বল-সিংভিদের ভূমিকা নিন্দাজনক এবং তাঁদের রাজ্য কংগ্রেসের কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে না। তিনি বলেছেন, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের আড়াল করতে চেয়ে কেন্দ্রের দুই কংগ্রেস নেতা তথা আইনজীবীর ভূমিকা পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সমর্থকদের ভুল বার্তা দিয়েছে। কথাটা ঠিক। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। কংগ্রেস সমর্থকরা এখন মনে মনে নরেন্দ্র মোদীর বিজেপিকে সমর্থন করছেন। বিশেষত, উত্তরপ্রদেশে বিপুল সাফল্য বাংলার মানুষের মন জয় করেছে। লোকসভার ভোটে যে বিজেপি জিতবে সে ব্যাপারে বাঙালির মনে আজ সামান্যতম সন্দেহ নেই। যেমন, সন্দেহ নেই যে তৃণমূল এখন তোলাবাজদের দল। যেমন, এখনই আগাম বলে দেওয়া যায় যে লোকসভা ভোটে বিজেপি চমক দেবে। সিপিএম-কংগ্রেস একটি আসনও পাবে না। লড়াইটা হবে বিজেপি বনাম তৃণমূল। বাকিরা প্রান্তিক হয়ে যাবে।

ত্রিশূলে ‘কন্ডোম’ পরানো মোটেও সহজ কাজ নয়

মাননীয় কবি শ্রীজাত

ফেসবুক।

আপনি বেশি ফেসবুকেই কবিতা লেখেন। সহজে হাততালি, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট পেতে আপনি ভালোবাসেন। তাই সেই ফেসবুকের ঠিকানাতেই চিঠি লিখছি। ফেসবুকে সব রকমের পাঠক রয়েছেন। সেখানে কবিতার চুলচেরা বিশ্লেষণ হয় না। কিন্তু অনেক অনেক মানুষ কবিতা পড়ার সুযোগ পান।

এটা কী করলেন আপনি! ফেসবুকে যেসব মন্তব্য আসছে তাতে তো দেখছি নিজের পাঠককুলের একটা বড় অংশকেই আপনি ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। আপনার গুণগ্রাহীরা বলছে, শব্দ ব্যবহারে আপত্তি নেই। কিন্তু এটি নাকি আলোচনা করার মতো কোনো কবিতাই নয়। সাহিত্য যদি মনোগ্রাহী না হয় তবে তার মূল্য কোথায়! চটকদার শব্দ ব্যবহার কি কবিতার মূল্য বাড়াতে পারে!

আপনি এখন বিখ্যাত। কবিতার পাঠকরা জানেন আপনি অনেক ভালো ভালো কবিতা লিখেছেন। সমাজ বদলাতে পারেননি কিন্তু আনন্দ পেয়েছেন, আনন্দ পুরস্কারও পেয়েছেন। এখন অবশ্য আপনি ‘কন্ডোম কবি’ হিসেবে আরও আরও বেশি পরিচিত। অভিনন্দন আপনাকে।

কবি, আপনি পরিবারে বিশ্বাস করেন না, ধর্মে বিশ্বাস করেন না, সমাজে বিশ্বাস করেন না, এমনকী রাষ্ট্রশক্তিকেও বিশ্বাস করেন না। আপনি নামের সঙ্গে পদবি ব্যবহার না করে বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনি ‘স্বজাত।’ নিজেকেই নিজে সৃষ্টি করেছেন। আপনার এই স্বজন্ম অনেকের প্রেরণা।

হে প্রতিবাদী কবি! আপনার কবিতায় এবং বক্তব্যে বার বার রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখেছি, শুনেছি। আপনার লেখনী বার বার পুলিশের বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। সাধারণ মানুষ আপনার কবিতায় ভরসা পেয়েছে। কিন্তু এখন সেই পুলিশের নির্ভরতায় ঘুম থেকে উঠে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত কেমন লাগছে? আপনার কলমকেও পুলিশ পাহারা দিচ্ছে না তো!

হে নির্ভীক কবি! আপনার ভয় নেই। আপনাকে যারা ‘বজ্জাত’ বলে সম্বোধন করছে পুলিশ তাদেরও ছাড়বে না। পুলিশ আপনার রক্ষক। মুখ্যমন্ত্রী আপনার রক্ষক। মামলা শুরু হওয়ার আগেই বিচারকের আসন থেকে মুখ্যমন্ত্রী রায় জানিয়ে দিয়ে বলেছেন— ‘শ্রীজাতর কিচ্ছু হবে না।’ অথচ তিনিই একদিন কার্টুন আঁকার জন্য অম্বিকেশ মহাপাত্রকে জেল খাটিয়েছেন।

হে মৌলবাদ বিরোধী কবি, আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের ক্ষমতায় বসা নিয়ে আপনি উদ্বিগ্ন। কিন্তু উদ্বেগের কারণটা জানাননি। শুধু ত্রিশূলে কন্ডোম পরাতে চেয়েছেন। বেশ করেছেন। আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে এমন প্রতিবাদ করার। কন্ডোমের এমন রূপক ব্যবহার করার। কিন্তু যোগী আদিত্যনাথও যে গণতন্ত্রের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় এসেছেন। কারও দয়ায় নয়। ধর্মমত নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষের সমর্থন নিয়ে। শুধু ওই রাজ্যেই নয়, এই রাজ্যেও ফেসবুকে মন্তব্য দেখে বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে ভারতের যোগীদের প্রতি শ্রদ্ধা গোটা দেশের মানুষের। আপনার পাঠকদের বড় অংশও সন্ন্যাসীর ক্ষমতায়ণের পক্ষে। কারণ, তাঁরা ভাবছেন— ভোগীরা ভক্ষক হয়েছেন, যোগীরাই হয়তো রক্ষক হতে পারবেন।

হে ‘শ্রী’ হতে জাত কবি, আপনি দেশের সব থেকে বড় প্রয়োজনীয় বস্তুটিকেই অপব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। জন্মনিরোধকের অপব্যবহার করবেন না প্লিজ। ভারতকে বাঁচাতে এখন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সর্বাগ্রে জরুরি। এ দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করার এটাই দাওয়াই। বিশ্বের দ্বিতীয় জনশক্তির দেশ ভারতের কাছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বড় বিপদ। বিশ্বের জন্যও বড় বিপদ। ভারতের ধর্মভিত্তিক জনবিন্যাসের যে চিত্র তা দেখে পৃথিবীর বড় বড় সমীক্ষা সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। আগামী ৫০ বছরে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম শক্তিধর দেশ হতে চলেছে। এর পিছনে রয়েছে মৌলবাদী চক্রান্ত। এই মৌলবাদকে পারলে কন্ডোম দিয়ে ঢেকে দিন।

হে কবি, আপনার কাছে একটি সাধারণ প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে মানুষের। এই চিঠিতে আমি শুধু সেটুকুই জানতে চাই। যে সরকার এখন আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছে তার নেতা মন্ত্রীরা গরিবের অর্থ কেড়ে নেওয়া চিটফান্ডের প্রশ্রয়দাতা। এটা এখন আদালতও বলছে। একশো দিনের কাজে শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা এরা লুঠ করেছে। মিড ডে মিলের জন্য গরিব শিশুদের বরাদ্দ টাকা খেয়ে নিয়েছে। কেন্দ্রীয় টাকা পেয়েও পোকা ধরা চাল খাওয়াচ্ছে গরিবকে। এই দুর্নীতিবাজদের কালো হাতে কন্ডোম পরাতে পারবেন? সবাই আপনার পাশে থাকবে।

—সুন্দর মৌলিক

এই সূর্যোদয়ের রং গৈরিক

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

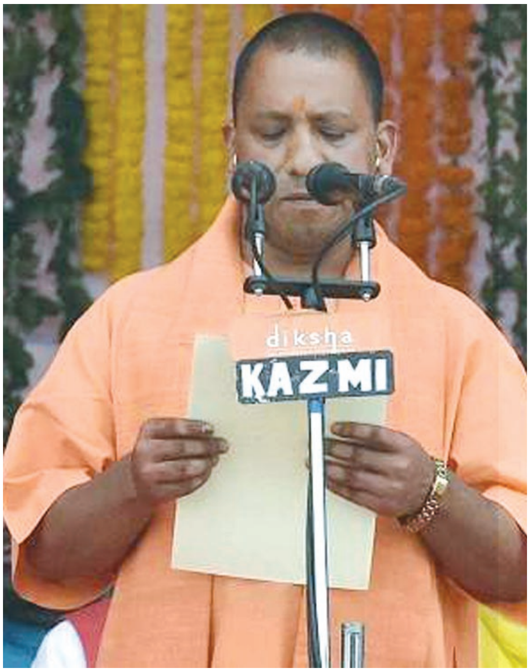

উত্তরাখণ্ড আর উত্তরপ্রদেশের বিপুল জয়, বিশেষত উত্তরপ্রদেশের প্রশ্নাতীত বিজয়— যোগী আদিত্যনাথের মুখ্যমন্ত্রিত্ব আজ ভারত তথা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলিকে আকর্ষণ করেছে। বোঝা যাচ্ছে এক সময়ের শব্দ— 'সব পর ভারী অটলবিহারী'--- ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর পক্ষে যতটা সত্য ছিল আজ কৈলাসেশ্বর শিবের মূল ক্ষেত্র বারাণসীর সাংসদ নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীজীর ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই সত্য। তাঁর সামনে বাকি সব যুবক নেতৃত্ব আর জাতপাতের রাজনীতির জটিল কুটিল অঙ্কে সমাজকে ভেঙে ভোটবাক্স ভর্তির সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কৌশলে দক্ষ মায়াবতী বা লক্ষ্য ছিল বিজেপির প্রতিস্পর্ধী হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। এবারের দেশব্যাপী নির্বাচনে মানুষ বুঝিয়ে দিল সেই আশা আপাতত আকাশকুসুম। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমর আবদুল্লা পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, ২০১৯-এও বিজেপি বা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোনো বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের উচিত হবে তার পরের নির্বাচন— ২০২৪-এর কথা ভাবা। সব দল-গোষ্ঠী মিলে মোদীর বিরুদ্ধে মহাজোট গড়ার পরিকল্পনা করছে। এই উদ্যোগে তৃণমূলেশ্বরী আহ্লাদিত। তার হয়তো মনে হচ্ছে এবার তিনিই হবেন প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম জানেন কত ধানে কত চাল। সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে তাঁর কথা--- বিজেপির বিজয়রথ থেমে যাবে দক্ষিণে ও

মুলায়েম সিংহ কিংবা কট্টর গুণ্ডারাজের জবরদস্ত মুখ আজম খানেরা অত্যন্ত হালকা। ভারতীয় রাজনীতিতে সব থেকে ভারী এখন পদ্মফুল। গৈরিক ঝড়ে সবার ঘরবাড়ি খানখান হয়েছে। অন্য সব রাজনীতি হয়েছে অবান্তর। অপ্রাসঙ্গিক।

বামপন্থীরা পঞ্জাবে অর্ধশতের বেশি আসনে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল। ভোট পেয়েছে নোটা-র চেয়ে কম। বাজেয়াপ্ত হয়েছে জামানত। উত্তরপ্রদেশে ১৫২টি আসনে প্রাপ্ত ভোট ৩৫২! অর্থাৎ আসন পিছু তারা ২.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে! নিজের পরিবারের সবাই ভোট দিলেও তো এমন হবার কথা নয়। অথচ কেরলের আর এস এস কর্মীদের খুনে হাত রাঙানো মুখ্যমন্ত্রী পিনারই বিজয়ন সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে বলেছেন, বিজেপির ভোট শেয়ার কমেছে!

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বেসর্বা বিমুদ্রীকরণের পর তেড়েফুঁড়ে ভারতব্যাপী আন্দোলন করে ফিরলেন। আড়ালে তার পূর্বে যেখানে আঞ্চলিক শক্তি প্রবল। একে বলা যায় নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার কৌশল। অর্থাৎ প্রাক্তন কংগ্রেসি, ব্যাসকাশী থেকে বিচিত্র অসাধু উপায়ে ভোটে জেতা এই কংগ্রেসির কথা— আমরা না জিতলেও শশীকলা-মমতাকে হারান দেখি! না, নবীন পট্টনায়কের কথা তিনি বলেননি। জানেন নিশ্চয়— ওড়িশায় এখন প্রধান বিরোধী দল বিজেপিই।

যোগী আদিত্যনাথ সম্পর্কে অদ্ভুত আপত্তি দেখা গেল। তিনি উগ্র হিন্দু— তাঁর পক্ষে উত্তরপ্রদেশ চালানো শক্ত, অসম্ভব প্রায়। মন্দির চালানো আর রাজ্য চালানো এক ব্যাপার নয়। কেউ কেউ খবরের কাগজে ফটোশপ-এর কেরামতিতে যোগীর চরিত্রহননের ব্যবস্থা পাকা করল। কেউ বলল, ওই গেরুয়াধারী ভণ্ড অশিক্ষিত। তখনও কেউ একথা বলেনি যে এই আশ্চর্য বীর সন্ন্যাসী গাড়োয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে স্নাতক, যোগ দর্শন ও অনুশীলন বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক। যোগী একবারও নির্বাচনে হারেননি। উত্তরোত্তর জিতে আসছেন— ক্রমাগত জনসমর্থন বাড়ছে। লোকসভায় তাঁর উপস্থিতি গড়কে ছাপিয়ে গেছে। অংশগ্রহণ আর প্রস্তাব উত্থাপনেও তিনি অনেক এগিয়ে। এ অবস্থায় তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তুলেছেন তেজস্বী যাদব— লালু তনয়, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই তরুণের শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে অকৃতকার্য হওয়া! কে যে কার যোগ্যতা পরিমাপ করছে!

একটা কথা খুব চলছে। তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী সাংবাদিকরা ব্যাখ্যা করেছেন, উত্তরপ্রদেশের মুসলমানরাও বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। বিশেষ করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক-প্রথার বিরুদ্ধে মুসলমান পরিবারে অত্যাচারিত মা-বোন-গৃহবধূরা সমবেতভাবে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। একথাটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করলে কিন্তু বিপরীত সিদ্ধান্ত উঠে আসবে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ নিচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ।

শতকরা ৪৫ বা তার চেয়ে বেশি মুসলমান-অধ্যুষিত বিধানসভা আসনের মোট সংখ্যা উত্তরপ্রদেশে ১৭টি। তার মধ্যে ছ'টি আসনে জিতেছে বিজেপি; বাকি আসনগুলিতে নয়টিতে এসপি, দুটিতে বিএসপি জিতেছে।

প্রাপ্ত ভোট বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে এসপি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। বিএসপি-এসপির মোট প্রাপ্ত ভোট সব ক্ষেত্রেই বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের থেকে বেশি। এই আসনগুলিতে বিএসপি আর এসপি মুসলমানদের দাঁড় করিয়েছিল। সবাই জানি, উত্তরপ্রদেশে এবারের নির্বাচনে বিজেপি একজন মুসলমানকেও দাঁড় করায়নি। অস্যার্থ, মুসলমান ভোট এসপি বিএসপি-র মধ্যে বিভাজিত হয়েছে।

মুসলমানরা ভোট দিক না দিক উত্তরপ্রদেশে একটি কথা প্রমাণ হয়েছে, ভারতের সংখ্যাগুরু মানুষ যদি একসঙ্গে একটি রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে তাহলে সেই শক্তি অপরাজেয় হতে বাধ্য। দেশ জোড়া এই বার্তা এবারের পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে প্রমাণিত হলো। কংগ্রেস এই নির্বাচনে ৪ : ১ গোলে পরাজিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ড- উত্তরপ্রদেশ তো বটেই গোয়া-মণিপুরেও বিজেপির জয় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দুটি রাজ্যেই কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, ছোট রাজনৈতিক দলগুলি কংগ্রেসকে সমর্থন না করায় তারা সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়েছে। সারা দেশে কংগ্রেস অবান্তর হয়ে যাওয়া বামপন্থী আর অখিলেশ যাদবের মতো কিছু বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত দল ছাড়া বন্ধু পাচ্ছে না। উত্তরপ্রদেশে তাদের প্রাপ্ত আসন দু' অঙ্কেও পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে! ১০৫টি আসনে দাঁড়িয়ে তারা পেয়েছে ৭টি আসন। একটি মশকরা সামাজিক দূর সঞ্চারে চালু হয়েছে— অখিলেশ পিতাকে বলছেন, রাজ্যে আমরা হারিনি কংগ্রেস আমাদের হারিয়ে দিয়েছে।

গোয়া নির্বাচনের ফল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আগেও বিজেপি-সরকার ছিল। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী ভোট স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিপক্ষে গেছে। মনোহর পার্রিকরকে ফিরিয়ে এনে বিজেপি মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টি আর গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির সমর্থনে সরকার গড়ে স্বাধীনতা-বিরোধী দেশের পক্ষে বিপজ্জনক শক্তিগুলির উৎসাহ দমিয়ে দিল। ১৯৬১-তে গোয়া-দমন-দিউ ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়। তার আগে পরে পোর্তুগিজ চার্চগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদ, হিন্দু মন্দির ধ্বংস, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে। এবারের নির্বাচনের ফল জেনে বহু বিধায়কের উপর চাপ সৃষ্টি করে গেছে তারা। গোয়া-নির্বাচন তাই ভারতের সংহতির পক্ষে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত।

মণিপুরের নির্বাচনের ফল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। এন বীরেন সিংহের নেতৃত্বে মণিপুর সরকার গঠিত হলো; এন পি পি, এন এফ পি আর লোক জনশক্তি দলের সমর্থন তিনি পেলেন। কংগ্রেসের সন্ধ্যেয় অ্যান্ড্রে কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যাম কুমার সিংহ বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়কও সরকারকে সমর্থন করেছেন!

এনিয়ে অনেকে তৃণমূল আর বিজেপির গোপন বোঝাপড়ার তামাদি হয়ে যাওয়া তত্ত্ব প্রচার করছেন। দলের নেতা মুকুল রায় বলেছেন, ওখানে আমাদের বিধায়ক যেন কংগ্রেসকে সমর্থন করেন— সেটাই নাকি দলের নির্দেশ!

সংখ্যাতত্ত্বের কথা থাক। মূল কথা, ভারতীয় জাতিগঠনে উত্তর- পূর্ব ভারতে বিজেপির ক্রমপ্রসার একটি অত্যন্ত ইতিবাচক সংবাদ বলেই মনে করি। অসম অরুণাচলের পর মণিপুর তৃতীয় রাজ্য যেখানে বিজেপি শাসনক্ষমতায় এল। অর্থাৎ কংগ্রেসি কুশাসনে যে ভারত খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে— তাকে যোগ করে এক অখণ্ড দেশ— সাংস্কৃতিক জাতীয়তার একটি মহান যজ্ঞ উদযাপনের পর্ব এখন। একদা মণিপুরে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলন সেখানকার জনজাতির মধ্যে ভারত- চেতনা জাগ্রত করেছিল।

অরুণাচলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার পেয়েছে খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকেই। শ্রীচৈতন্যের সামান্য অগ্রজ বৈষ্ণবকুলতিলক একশরণ মন্ত্র, মহাপুরুষিয়া ধর্মের প্রবক্তা গুরুদেব শঙ্করদেবের মারফত গোটা অসম 'নামঘর' আর কৃষ্ণ-রুক্মিণীর নামগানে নিত্য মুখর। এসব অঞ্চলে বাংলাদেশের মুসলমান জিহাদিরা গোপনে ঢুকে পড়ছে— নষ্ট করছে চিরকালের জনবিন্যাস।

এর পাশাপাশি খ্রিস্টান মিশনগুলির উস্কানি, বিদেশি ভাবধারা উত্তর-পূর্ব ভারতকে নিত্য গোলযোগের ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। জনজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলে বিপথগামী কিছু বিদেশি ও কর্পোরেট অর্থে পুষ্ট তথাকথিত ছাত্রনেতারা কাশ্মীর-বস্তার ও মণিপুরের আজাদি-র স্লোগান তুলছে— জে এন ইউ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। মণিপুর নির্বাচন এই অসুস্থ প্রবণতার বিরুদ্ধে একটি সতর্কবার্তা। এটা ওই সব বিজাতীয় প্রগতিকামী বুঝবে এতটা আশা করি না। তবে এবারের গৈরিক ঝড়ে সব দল-উপদলই চোখ টিপছে। সূর্য ওঠার পর সব নিশাচর প্রাণী যেমন করে থাকে। আর কে না জানি, সূর্যোদয়ের রং গৈরিক। ■

পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান জেহাদি কর্মকাণ্ড জাতীয় স্বার্থের পক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ : আর এস এস

গত ১৯-২১ মার্চ কোয়েম্বাটুরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানম পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও সেই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবটি এখানে প্রকাশ করা হলো :

পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি শক্তির বাড়বাড়ন্তের জন্য নিরন্তর হিংসামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, রাজ্য সরকারের মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির জন্য রাষ্ট্রবিরোধী শক্তিগুলিকে ইন্ধন জোগানো এবং রাজ্যের হিন্দু জনসংখ্যার ক্রমহ্রাসমান অবস্থা ইত্যাদির প্রতি অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। দেশবিরোধী জেহাদি কট্টরপন্থীদের ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে মাত্র ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মালদহ জেলার কালিয়াচক থানা আক্রমণ, লুঠপাট এবং অপরাধীদের নথিপত্র জ্বালিয়ে দেওয়া এবং রাজ্যের বহুস্থানে সুরক্ষাবাহিনীর উপর হামলার ক্রমবর্ধমান ঘটনা দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং আইনের শাসনকে বড় রকমের চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে। প্রকাশ্যে কট্টরপন্থী মৌলবাদীদের হিংসাত্মক এবং উস্কানিমূলক ফতোয়া জারি অব্যাহত রয়েছে। কাটোয়া, কলিগ্রাম, ইলামবাজার, মেটিয়াবুরুজ (কলকাতা)-সহ অনেক স্থানে কট্টরপন্থীরা হিন্দু সমাজের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

কট্টরপন্থীদের চাপে সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে হিন্দু সমাজের এক বিশাল অংশ পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একইভাবে জালটাকার ব্যবসা, গো-সম্পদ চুরি ও অনুপ্রবেশও অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলছে। বর্ধমানে (খাগড়াগড়ে) বোমা বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে এন আই এ দেখেছে যে রাজ্য জুড়ে অনেকগুলি সন্ত্রাসবাদী-চক্র সক্রিয় রয়েছে এবং জেহাদি সন্ত্রাসবাদীদের জাল সীমান্তের উভয় পারে বিছানো আছে।

একদিকে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে উপদ্রবকারী জেহাদি ও কট্টরপন্থীদের মন্ত্রিত্ব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে বসিয়ে উৎসাহিত করা হচ্ছে, অপরদিকে হিন্দুসমাজের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিছুদিন আগে মহরম পালনের জন্য দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের 'সময়' অস্বাভাবিকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়— যার জন্য কলকাতার উচ্চ আদালতও রাজ্য সরকারকে ভর্ৎসনা করেছে।

বিগত কয়েক বছরে বোমাবাজি, হিংসা, অগ্নিসংযোগ, মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার ইত্যাদি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হিন্দু সমাজের উপর ঘটে চলা এই সমস্ত অত্যাচারের কারণে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে তপশিলি শ্রেণীর মানুষজন। জুরানপুর, বৈষ্ণবনগর, খড়্গপুর এবং মল্লারপুরে তপশিলি শ্রেণীরই ৫ জন এবং অন্য শ্রেণীর ১ জনকে হত্যা করা হয়েছে। দুর্গাপূজার দিন তপশিলি সমাজের ১৭ বছরের এক ছাত্রীর উপর অ্যাসিড বোমা ছুঁড়ে হামলা করা হয়—যাতে ছাত্রীটির মৃত্যু ঘটে। গত ১৩-১৪ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার ধুলাগড়ে হিন্দু সমাজের উপর সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট ও মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের বীভৎস ঘটনা ঘটে। রাজ্য সরকার এই কট্টরপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ না করে উপরোক্ত ঘটনা সমূহ লুকিয়ে ফেলার ব্যবস্থা নেয়। সব থেকে চমকপ্রদ ঘটনা হলো যে, যখন কয়েকজন নিরপেক্ষ সাংবাদিক এই বীভৎস সংবাদ প্রচারে সাহস দেখান, তখন তাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়।

দেশভক্তির শিক্ষা দেওয়া হয় এমন বিদ্যালয়গুলিকে রাজ্য সরকার বন্ধ করার হুমকি দিচ্ছে, অন্য দিকে কুখ্যাত শিমুলিয়া মাদ্রাসার মতো কয়েক হাজার মাদ্রাসার ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকছে— যেখানে কট্টরপন্থী জেহাদিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। কট্টরপন্থীদের চাপে পড়ে পাঠ্যপুস্তকগুলিতে মূল বাংলা শব্দের বিকৃতিকরণ চলছে। অনেক স্থানে বিদ্যালয়গুলিতে পরম্পরাগত ভাবে যে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হোত, সেই পূজাও বন্ধ করার চেষ্টা চলে। মিলাদ-উন-নবি পালনের নাম করে বিদ্যালয়গুলির ইসলামিকরণের অপচেষ্টাকে রাজ্য সরকার না দেখার ভান করছে। গত বছর কলকাতা থেকে মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে হাওড়া জেলার তেহট্ট হাইস্কুলে ১৭৫০ জন ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়টিতে মিলাদ-উন-নবি

উৎসব পালনের অনুমতি না পেয়ে উগ্রপন্থীরা বিদ্যালয়টিকে কব্জা করে নিজেদের ধর্মীয় পতাকা উড়িয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ঘরে বন্দি করে রাখে। এর পরিণাম এক মাস বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকে।

ভারত ভাগের সময় বাংলার হিন্দুবহুল অঞ্চলই পশ্চিমবঙ্গ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাছাড়াও পূর্ব পাকিস্তান— যা বর্তমান বাংলাদেশ, সেখানে নিরন্তর প্রতারণা ও অত্যাচারের কারণে হিন্দু নাগরিকরা বিরাট সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো,

বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বিশাল সংখ্যায় হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে আসার পরেও রাজ্যের হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৫১-তে যেখানে ৭৮.৪৫ শতাংশ ছিল, ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী তা হ্রাস পেয়ে ৭০.৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রের ঐক্য ও অখণ্ডতার ক্ষেত্রে বিষয়টি গভীর উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা উগ্র হিংসা এবং রাজ্য সরকারের মুসলমান তুষ্টিকরণের নীতিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করছে এবং সমগ্র দেশবাসীর কাছে আবেদন রাখছে যে, জেহাদি হিংসা ও রাজ্য সরকারের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষকে জাগরিত করুন। দেশের গণমাধ্যমের কাছেও আগ্রহ করা হচ্ছে, যে তারাও এই ভীষণ পরিস্থিতিকে দেশের সামনে প্রকাশ করুক। প্রতিনিধি সভা রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানাচ্ছে যে, ক্ষুদ্র ভোট রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে নিজেদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করুক।

অখিল ভারতীয় প্রতিনিধিসভা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বিষয়ে নজর রাখতে আবেদন জানাচ্ছে যে, যাতে দেশ-বিরোধী জেহাদিদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ড. জিষ্ণু বসু। পাশে প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস।

পশ্চিমবঙ্গে জিহাদি তৎপরতা বৃদ্ধিতে সঙ্ঘ উদ্বিগ্ন

কোয়েম্বাটোরে অনুষ্ঠিত অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় এবারে একটিমাত্র বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেটি হলো, পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান জিহাদি হিংসা এবং তার থেকে ভারতের বিপদ। সম্প্রতি কলকাতার কেশব ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দক্ষিণবঙ্গ শাখার পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি মৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু বলেন, ইসলামি মৌলবাদীরা হিন্দু সমাজের তথাকথিত পিছিয়ে পড়া তপশিলি শ্রেণী ও জনজাতিদের নানারকম ফাঁদে ফেলে সহজ শিকার বানানোর চেষ্টা করছে। প্রশাসনিক শৈথিল্য এবং তুষ্টিকরণের রাজনীতির সৌজন্যে এদের সাহস এতটাই বেড়ে গেছে যে এরা কালিয়াচকে থানা পুড়িয়ে দিতেও পিছপা হয়নি। প্রকাশ্যে পাথর ছুড়ে মারার ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে বহুদিনের বাসিন্দা হিন্দুরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় উঠে আসে কাটোয়া-কলিগ্রাম- ইলামবাজার থেকে শুরু করে তেহট্ট-নন্দীগ্রামের কথা। ড. বসু বলেন, 'ভাবতেই আশ্চর্য লাগে স্বাধীন ভারতে একদল মুসলমান মৌলবাদী একটি স্কুলে ঢুকে ফতোয়া দিচ্ছে যে নবি দিবস পালন করতে না দিলে সরস্বতী পুজো করতে দেওয়া হবে না!' উল্লেখ্য, করতে দেওয়াও হয়নি। এখনও স্কুলটি এক মাস বন্ধ ছিল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশের মার খেয়েছে পড়ুয়ারা। একই প্রবণতা দেখা গেছে নন্দীগ্রামে। সেখানে মুসলমান ছাত্রদের টুপি এবং ছাত্রীদের হিজাব পরতে দেওয়ার দাবিতে বচসা শুরু হয়। বেধড়ক মার খান প্রধান শিক্ষক।

সম্প্রতি বিদ্যাভারতী পরিচালিত ১২৫টি স্কুল অবিলম্বে বন্ধ করার নোটিশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। ড. বসু সখেদে বলেন, বিদ্যাভারতীর স্কুল বন্ধ করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু শিমুলিয়া মাদ্রাসার মতো প্রতিষ্ঠান যারা মৌলবাদে ইন্ধন জোগায় তাদের কিছু বলা হচ্ছে না। বিদ্যাভারতীর স্কুলগুলি কতটা ধর্মনিরপেক্ষতার উদাহরণস্বরূপ তিনি সরফরাজের কথা বলেন। এই মুসলমান ছাত্রটি অসমে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যাভারতী পরিচালিত একটি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে প্রথমস্থান অধিকার করেছে। তার বোনও এই একই স্কুলের ছাত্রী। বিদ্যাভারতীর যে-কোনো স্কুলে গেলে মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের দেখতে পাওয়া যায়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ড. বসু সখেদে মুসলমান তুষ্টিকরণ রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেন এবং ভোটের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থে কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারকে আহ্বান জানান।

উত্তেজক ভাষণে চিকিৎসা ব্যবস্থার অসুখ সারবে না

সাধন কুমার পাল

যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটারে ভিলেন যখন মার খেতে থাকে তখন দর্শক উত্তেজিত হয়ে উঠে, হাত তালি দিয়ে হিরোকে সমর্থন করে। টেট কেলেঙ্কারি থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যখন অর্থ-পিশাচ ডাক্তারবাবু ও চিকিৎসা ব্যবসা ফেঁদে বসা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে তোপ দাগছেন, বেসরকারি হাসপাতাল সংক্রান্ত 'দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট (রেজিস্ট্রেশন, রেগুলেশন অ্যান্ড ট্র্যান্সপারেন্সি) বিল ২০১৭ পেশ ও পাশ করছেন তখন মানুষকে সিনেমার মতোই উত্তেজিত হতে, দু'হাত তুলে সমর্থন করতে দেখা গেছে। সন্দেহ নেই মানুষের এই উত্তেজনা, মিডিয়ার মাতামাতি এ সবই সাময়িক। দু'দিন পরে উত্তেজনা থিতিয়ে পড়বে, মিডিয়া অন্য ইস্যু নিয়ে মেতে উঠবে। কিন্তু যে প্রশ্নটা ঘুরে ফিরেই আসবে তা হলো অর্থ-পিশাচদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর 'এনাফ ইজ এনাফ' টাইপের কড়া সতর্ক বার্তা ও বিশেষ আইনি দাওয়াই কি বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অসুস্থতা দূর করতে পারবে?

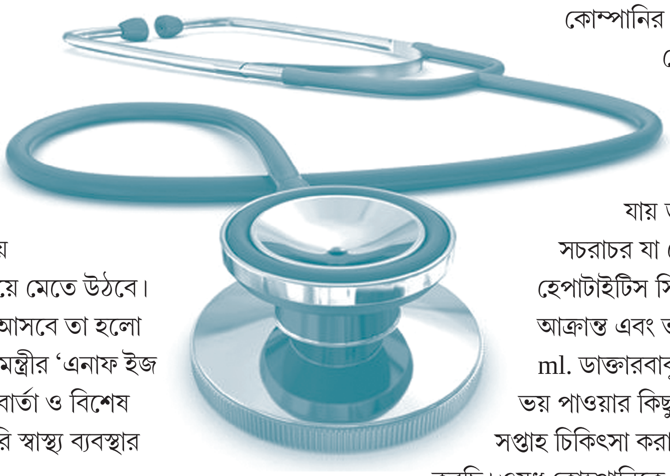

২০১২ সালে হেপাটাইটিস সি আক্রান্ত একজন রোগীর চিকিৎসার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যেতে পারে। ২০১২-র ২২ অক্টোবর চেন্নাই অ্যাপলো হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ৪৭ বছর বয়স্ক (পরিচয় অনুল্লেখিত রাখা হলো) এক ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ANTI HCV ELISA পজিটিভ আসে। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর ওই হাসপাতালের হেপাটোলজিস্ট ডাঃ এন মুরুগানের পরামর্শে ব্যয়বহুল (পনেরো হাজার টাকা) জেনোটাইপ ও ভাইরাল লোডের পরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় রোগী হেপাটাইটিস সি জেনোটাইপ-4 ভাইরাস আক্রান্ত এবং ভাইরাল লোড 3,366,819 IU/ml. রিপোর্ট দেখে ডাঃ মুরুগান যা বললেন তা রীতিমতো ভয়ের। বললেন খরচ প্রতি মাসে ষাট হাজার, কমপক্ষে ছয় মাস ও সর্বোচ্চ এক বছর চিকিৎসা করাতে হবে এবং চিকিৎসায় সাফল্যের সম্ভবনা '৬০ পার্সেন্ট'। সন্দেহ নেই একজন সাধারণ চাকুরের ক্ষেত্রে মাত্র ষাট শতাংশ সাফল্যের সম্ভাবনা নিয়ে এরকম একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসায় সায় দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

এরকম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে কোনো এক সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেলে যে কলকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ এস এন হালদার হেপাটাইটিসের চিকিৎসা করেন। চেন্নাই থেকে কলকাতা ফিরে দু'টাকার টিকিট কেটে আউটডোরে ডাঃ হালদারকে দেখানো হলো। চেন্নাই অ্যাপেলোর রিপোর্ট দেখে প্রথমেই মন্তব্য করলেন কেন এরকম রিপোর্ট এলো বুঝতে পারছি না। ভারতে সাধারণত এইচ সি ভি জেনোটাইপ-4 দেখা যায় না। এর পর হাসপাতালেই বিনামূল্যে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো। ডাক্তারবাবু একটি ওষুধ কোম্পানির মাধ্যমে বিনা মূল্যে জেনোটাইপ ও ভাইরাল লোডের ব্যয়বহুল পরীক্ষাটিরও ব্যবস্থা করালেন। রিপোর্টে দেখা যায় ডাক্তারবাবুর আন্দাজ অনুসারে সচরাচর যা দেখা যায়, রোগী সেরকমই হেপাটাইটিস সি জেনোটাইপ-3b ভাইরাস আক্রান্ত এবং ভাইরাল লোড 15367 IU/ml. ডাক্তারবাবু ভরসা জোগালেন। বললেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চার থেকে বারো সপ্তাহ চিকিৎসা করালেই ঠিক হয়ে যাবে আশা করছি। ওষুধ কোম্পানিকে ডেকে কথা বলে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করলেন। প্রতি সপ্তাহে একটি করে মাসে চারটি ইনজেকসন নিতে হবে যার মধ্যে দুটো কিনতে হবে বাকি দুটো ফ্রি। এতে খরচ পড়বে মাসে সর্বসাকুল্যে ২৫ হাজার টাকার মতো।

হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা শুরু হলো। বিনা মূল্যে এন্ডোস্কোপির মতো নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো। যতবার দেখতে আসতেন ডাক্তারবাবু ভরসা জোগাতে ভুলতেন না। বলতেন হেপাটাইটিস সি সেরে যায়, আপনি একদম সুস্থ হয়ে উঠবেন।

প্রতি সপ্তাহে রক্তের বেশ কিছু পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুকে রিপোর্ট দেখিয়ে তার পর ওই নির্দিষ্ট ইনজেকশন নিতে হতো। উত্তরবঙ্গের মানুষের পক্ষে কলকাতায় দীর্ঘ সময় থেকে এই ধরনের চিকিৎসা করানো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ডাক্তারবাবুর সহযোগিতা ও সহমর্মিতায় এই সমস্যাও সমাধান হয়ে যায়। প্রতি সপ্তাহে ই-মেলে পাঠানো রিপোর্ট দেখে ফোনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। ব্যস্ততার মধ্যে নিজে থেকে ফোন করেও খোঁজ খবর নিতেন প্রায়ই। মাসে একবার করে কলকাতায়

গিয়ে প্রাইভেট চেম্বার নয়তো ট্রপিক্যাল মেডিসিনের আউটডোরে দু'টাকার টিকিট কেটে ডাক্তারবাবুকে দেখাতে হোত। রোগের প্রকৃতিগত কারণেই এক বছর চিকিৎসা চালাতে হলেও ডাক্তারবাবু শুরুতে সেকথা বলেননি। তাতে ব্যয়বহুলতার চাপে চিকিৎসার শুরুতেই রোগী মানসিক ভাবে ভেঙে পড়তে পারতো। নিজের প্রাইভেট চেম্বারে ডেকে কোনো ছুতোতেই কোনোরকম বাড়তি টাকা পয়সা না নিয়ে সরকারি হাসপাতালের আউটডোরের একজন রোগীকে একজন ডাক্তারবাবু এরকম যত্ন নিয়ে এক বছর ধরে চিকিৎসা করে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তুলেছেন, সন্দেহ নেই এটি একটি অনুকরণযোগ্য ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

এখন ২০১৭। ওই রোগী এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। এ থেকে এটা সংশয়াতীত ভাবে বলা যায় যে সেদিন চেন্নাই অ্যাপলো নিজের অর্থলিপ্সা পূরণ করেও সঠিক রিপোর্ট দেয়নি। হয় পরীক্ষা না করেই রিপোর্ট দিয়েছিল অথবা একের রিপোর্ট অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে ছিল। সেদিন একটু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে যদি চেন্নাই অ্যাপলোতে এই রোগীর চিকিৎসা হোত তাহলে ওঁর অন্তিম পরিণতিও কলকাতা অ্যাপলোতে ভর্তি হওয়া পথ দুর্ঘটনায় আহত ডাকুনির বাসিন্দা সঞ্জয় রায়ের মতো হতে পারতো।

এই ঘটনা থেকে এটা সংশয়হীন ভাবে বলা যায় যে ডাক্তারবাবু থেকে শুরু করে চিকিৎসার সঙ্গে যুক্তদের যদি মানবিকতা, কর্তব্য বোধ, সহমর্মিতা থাকে তাহলে বর্তমান অবস্থাতেও সরকারি হাসপাতালগুলি মানুষের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাস্থল হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে অ্যাপলোর মতো অর্থ পিশাচ বেসরকারি হাসপাতাল ও ডাক্তারবাবুরা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই নিজেদের রক্তচোষা মানসিকতা পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে। এই ধরনের প্রতিযোগিতাই বোধ হয় চিকিৎসা ব্যবস্থার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের শ্রেষ্ঠ উপায়।

> **“প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কিংবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতা মন্ত্রীরা নিজেরা অসুস্থ হলে বিশেষ যত্নের বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হবেন আর আম জনতাকে ভালো করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের ধমকাবেন এটা চলতে পারে না।”**

সংবাদমাধ্যমে এই ধরনের খবর আসতে শুরু করেছে যে আইন পাশ ও মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের জেরে ফ্যাসাদে পড়ার ভয়ে অনেক ডাক্তারবাবু অপারেশন এবং রোগীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে ভয় পাচ্ছেন। এতে নতুন ধরনের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। ডাক্তার মানেই অসৎ রক্তচোষা এমনটা নয়। নিজের সবটা উজাড় করে দেওয়ার পথে যদি ফ্যাসাদে পড়ার ভয় থাকে তাহলে কোনো ডাক্তারের পক্ষেই রোগীকে সুস্থ করে তোলার মতো চ্যালেঞ্জ নেওয়া সম্ভব নয়। সেজন্য আইনটিকে পাশে রেখে এগিয়ে দিতে হবে সেবা, মানবিকতা, সহমর্মিতার মতো মানবিক গুণগুলিকে। নিজের পেশাকে সম্মান করে যে ডাক্তারবাবুরা এই সমস্ত গুণকে সম্বল করে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেন তাদের এগিয়ে দিতে হবে সম্মানিত করতে হবে, আরো বেশি করে দায়িত্ব দিতে হবে।

পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেই গুণমানে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা বলতে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই বোঝায়। চিকিৎসার সরকারি ব্যবস্থাটিকে নির্ভরযোগ্য করে তোলাই বোধ হয় বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সুস্থ করে তোলার শ্রেষ্ঠ দাওয়াই। সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে চাই সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা। সাহস থাকে সরকারি এমন আইন করুন না, যাতে সরকারি সুবিধা নেওয়া কোনো ব্যক্তি সরকারি হাসপাতাল ছাড়া চিকিৎসা করাতে পারবে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কিংবা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতা মন্ত্রীরা নিজেরা অসুস্থ হলে বিশেষ যত্নের বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারস্থ হবেন আর আম জনতাকে ভালো করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুদের ধমকাবেন এটা চলতে পারে না।

চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা ফেরানোর প্রয়াস শুরু হওয়া উচিত চিকিৎসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলের মধ্যে মানবিকতা, কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতার জাগানোর মতো কর্মসূচি নেওয়ার মধ্য দিয়ে। সন্দেহ নেই এটি একটি কঠিন, দীর্ঘমেয়াদি, সময়সাপেক্ষ বহুমুখী প্রক্রিয়া। ছাত্রাবস্থায়ই যাতে এই গুণগুলি হবু নাগরিকদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় সেরকম ব্যবস্থাও প্রচলিত শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকতে হবে। 'মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে' ধরনের গরম গরম ডায়লগ দিয়ে, বিল এনে আইন পাশ করে যদি অবস্থার পরিবর্তন করা যেতো তাহলে শিক্ষার অধিকার, খাদ্যের অধিকার আইনের মাধ্যমেই সবার ঘরে শিক্ষা, সবার মুখে অন্ন পৌঁছে দেওয়া যেতো। আইন করেই দুর্নীতি, পণপ্রথা, শিশু শ্রমের মতো নানা দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি দূর করা যেতো। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

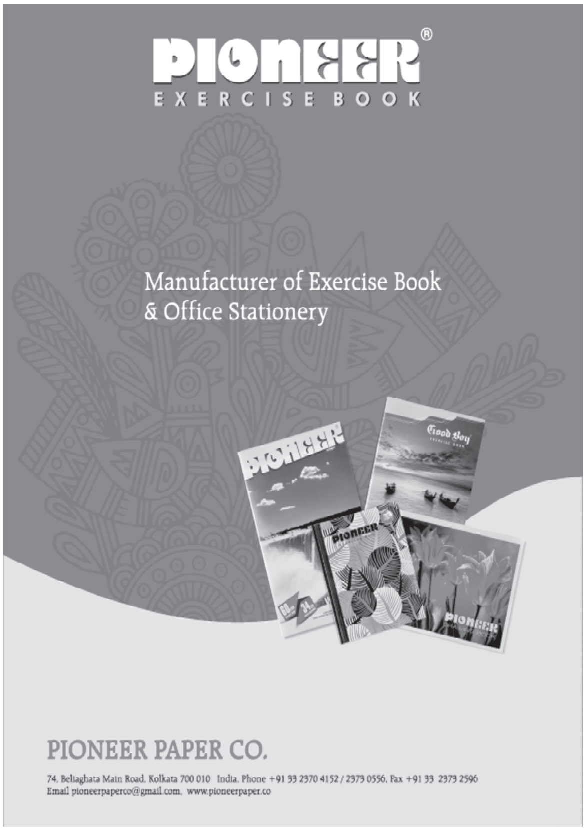

''যে উদ্দীপনাময় বাণী আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কাছে শুনেছি জ্বলন্ত ত্যাগের বাণীই ছিল তার মধ্যে সর্বপ্রধন। গভীর আবেগের সঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন, 'সম্পূর্ণভাবে কামিনী, কাঞ্চন এবং যশাকাঙ্ক্ষা (এর মধ্যে সবচেয়ে বিঘ্নকারক যশাকাঙ্ক্ষা) বর্জিত হয়ে আমার প্রভুর মতো যথার্থ সন্ন্যাসী হিসেবে যেন আমি মৃত্যুবরণ করতে পারি'। তবু এই একই তীব্র বৈরাগ্যময় জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে আদর্শ গৃহী রূপেও রূপায়িত হয়েছিল এবং সেজন্য সকলকে রক্ষা ও পরিত্রাণ করা, সর্বপ্রকার জাগতিক দ্রব্যাদি ব্যবহারের শিক্ষাগ্রহণ এবং শিক্ষাদান, নূতন করে সমাজ সংগঠন ও জীবনযাত্রার পুনর্গঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তিনি অনুভব করতেন।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পশ্চিমবঙ্গে ইসলামিকরণের সহায় রাজশক্তি

মোহিত রায়

১৮৭২ সালের প্রথম জনগণনার পর থেকেই বাংলার মুসলমান সমাজ তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এই জনগণনায় জানা যায় যে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৪৭ শতাংশ, প্রায় হিন্দুদের সমান। আর এই জনসংখ্যার বেশিরভাগ থাকেন পূর্ববঙ্গে। ইতিহাস চর্চায় সেকুলার পণ্ডিতদের দাপটে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে এখনো প্রকৃত অনুসন্ধানের কাজ যথেষ্ট বাকি রয়ে গেছে। সম্পর্ক আর যাই হোক দিনে দিনে যে খারাপের দিকে গেছে তা নিয়ে খুব একটা দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। বাংলায় ১৯৩৭ সাল থেকে ভোট দিয়ে যে সরকার গঠন করা শুরু হয় (যদিও এই ভোট একেবারে সার্বজনীন ছিল না) তাতে সংখ্যার জোরে ও ইংরাজ শাসকের আনুকূল্যে মুসলমানদের আসন সংখ্যা ছিল অনেকটাই বেশি। হিন্দু আসন আবার তপশিলি কোটায় ভাগাভাগি ছিল। সেই ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলা মুসলিম লিগের শাসন ও ইসলামি দাপাদাপি দেখেছে। যা আর যাই হোক দুই সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বিশেষ কোনো বার্তা বয়ে আনেনি। পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাবে বাংলার মুসলমান ছিল জিন্নার বড় সমর্থক। ভারতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা ১৯৪৬-এর আগস্টে কলকাতার দাঙ্গা ও তাতে পরাজিত বাঙালি মুসলমানের প্রতিশোধ ১৯৪৬-এর অক্টোবরে নোয়াখালি গণহত্যা। এসবের পর পাকিস্তান গঠনের প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাগ। ১৮৭২-এর ৪৭ শতাংশ মুসলমান ১৯৪৭-এ বেড়ে ৫৩ শতাংশ, ফলে পুরো বাংলাই দাবি করে বসেন জিন্না সাহেব। এর সমর্থনে ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গার নায়ক সুরাবর্দি বুঝেছিল জিন্নার পাকিস্তানে তাঁর তেমন কদর নেই। ফলে একটা 'স্বাধীন বাংলা'-র ধুয়ো তোলে। এতে বড় সঙ্গী পায় নেতাজী সুভাষের দাদা শিশির বসুকে। এই শিশির বসুর পরিবারের একটি অংশ নেতাজীর নাম করে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এখনকার সুরাবর্দিদের মদত যোগাচ্ছে। সবশেষে মঞ্চে এলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেসও পথে এলো। বাংলার হিন্দুপ্রধান জেলাগুলি নিয়ে প্রতিষ্ঠা হলো পশ্চিমবঙ্গের। পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি রমরমার এখানেই শেষ হবার কথা। কিন্তু গত চার দশকে এর উল্টোটাই ঘটে চলেছে। সেই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা।

বাংলায় ইসলামি প্রসারের বিষয়টির আলোচনায় প্রবেশের প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে বাংলায় এত মুসলমান জনসংখ্যা হলো কেন? ১৯০১ সালের জনগণনা বিচারে দেখা যায় উত্তর ভারতে (উত্তরপ্রদেশ, বিহারে) মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ১৩-১৪ শতাংশ। একই সময়ে বাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা ৫১ শতাংশ, পূর্ববঙ্গে ৬৬ শতাংশ। বাংলায় এই মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে বেশ কিছু কারণ ছিল এবং এ ব্যাপারে সৎ গবেষকরাও একমত নন। তবে একটা বিষয়ে এখন সৎ গবেষকরা একমত যে এর সঙ্গে হিন্দু সমাজের জাতপাতের বিচারের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। জাতপাতের নামে ভেদাভেদ উত্তর ভারতে বাংলার থেকে অনেক বেশি, এখনো তা প্রকট। উত্তর ভারত মুসলমান শাসনে রয়েছে অনেক বেশিদিন, সেখানে সরাসরি ইসলামি নবাব মোল্লাদের দাপট ছিল অনেকগুণ বেশি। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত বাংলার থেকে অনেক কম। উত্তর ভারতে মুসলমানদের মধ্যে একটি বড় অংশ আবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত নয়, বাংলায় প্রায় সব মুসলমান স্থানীয় মানুষ। সুতরাং ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ডাকে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এ তত্ত্ব অচল। অথচ এই তত্ত্বই দীর্ঘদিন বাংলার হিন্দু লিবারেল মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, আর বামপন্থীরা তাকে কোরানের মতো সত্য বলে প্রচার করেছে। আজকের দলিত-মুসলিম ঐক্যের লোকেরাও বাংলায় (বেশ কিছু মতুয়াপন্থী) এই অচল কথাই বলে চলেছে। ইসলামের ধর্মান্তর মূলত রাজ্য বিজয়, অর্থনৈতিক অত্যাচার, নারী লুণ্ঠন ইত্যাদির জোরে যা সবই ইসলামে ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃত। এজন্যই আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ রাজ্যগুলি বা ইরানে অগ্নি উপাসকরা কেউ জাতপাত বিচার করতেন না অথচ সেই দেশগুলি ১০০ শতাংশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। বাঙালি হিন্দু, বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ, কেউ 'গনিমতের মাল' কথাটার মানে জানেন না। 'গনিমতের মাল' কথাটির অর্থ কাফেরদের থেকে লুণ্ঠন করা বস্তু, তা নারী-পুরুষও হতে পারে, এবং এই লুণ্ঠন করা বস্তু ধর্ম স্বীকৃত। কাফেরদের সম্পত্তির ধর্ম স্বীকৃত লুণ্ঠন যার মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত এবং যে বিধান আজও অপরিবর্তিত--- এমন ধর্মের প্রতি

সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর শিমুলিয়া মাদ্রাসা (ফাইলচিত্র)।

কাফেরদের সহানুভূতির একমাত্র কারণ হতে পারে অজ্ঞতা।

বাংলায় ইসলাম

বাংলায় ইসলামের প্রবেশ তরবারির জোরেই। ১২০৪ সালে বক্তিয়ার খিলজির গৌড় বিজয় দিয়ে শুরু। শুরু থেকেই এই মুসলমান শাসনকর্তাদের একটি প্রধান কাজ ছিল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা ও সেইসব মন্দিরের অংশ দিয়ে মসজিদ গড়া। বাংলার অন্যতম প্রাচীন মসজিদ জাফর খানের মসজিদ বাংলার তীর্থস্থান ত্রিবেণীতে এবং এই মসজিদটির পাথরগুলি হিন্দু মন্দিরের, পাথরের পিছনদিকে রয়েছে দেবদেবীর মূর্তি। এখানে একটি শিলালিপিতে গর্ব করে লেখা আছে কীভাবে তরবারি দিয়ে কাফেরদের বিনাশ করা হয়েছে। এই সময়ের চারশো বছর পর্যন্ত আর কোনো হিন্দু মন্দির তৈরি হয়নি। এজন্য বাংলায় (দুই অংশেই) কোনো প্রাচীন মন্দির নেই। তুলনামূলক ভাবে প্রাচীন ঢাকার রমনা কালী মন্দিরটিও ১৯৭১ সালে প্রথম পাকিস্তানি সেনারা ও পরে বাংলাদেশ সরকার একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর্যাবর্তের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকা বাংলায় হিন্দু ধর্মে লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব ছিল অনেক বেশি। বাংলায় বিশেষত পূর্ব বাংলায় উত্তর ভারতের মতো হিন্দুধর্ম জাতপাত নিয়ে জাকিয়ে বসেনি। উত্তর ভারতের সঙ্গে স্থানের দূরত্ব যত বেড়েছে হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রীয় প্রভাব ততই কমেছে। বাংলায় 'উচ্চবর্ণের' মানুষেরা সংখ্যায় ছিল নগণ্য, তাঁদের দাপটও ছিল না। এখানে বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল স্থানীয় শিব, মনসা, শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর প্রভাব। এরকম অনেক শিথিল ধর্মীয় সামাজিক পরিস্থিতিতে মুসলমান নবাবদের তরবারির জোরে, অর্থনৈতিক চাপে ও তাদের বিশ্বস্ত সুফি পিরদের চাপে গ্রামীণ সমাজের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসলামে ধর্মান্তরিত এই বিশাল জনসমাজ নামেই মুসলমান ছিল, ইসলামের কঠোর নিয়মকানুন তারা জানতেন না। আরবি-ফারসিতে লেখা কোরান-হাদিশের নাগাল ছিল অনেক দূরে। ফলে বাংলায় গ্রামীণ সমাজে হিন্দু-মুসলমানের ফারাক ছিল কম। নামে, পোশাকেও তা সবসময় বোঝা যেত না। অধ্যাপক রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এটি ছিল হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যেই ইসলামি সংস্কৃতির প্রবেশ, তিনি একে বলেছেন সন্নিপাতি পরম্পরা (Syncrestic Tradition)। সন্নিপাতি কথাটির মধ্যে পতিত অর্থটি রয়েছে। অর্থাৎ মূলের থেকে বিচ্যুত পরম্পরা। কিন্তু ইংরাজদের ভারতে আসার পর বাংলার সামাজিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়। ভারত হয়ে যায় দারুল হরব বা শত্রুর দেশ। উত্তর ভারতেও জিহাদি ইসলাম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বাংলায় এই জিহাদি ইসলামের একজন প্রধান প্রবর্তক আরবে শিক্ষিত তিতুমির। এর পাশাপাশি শুরু হলো ফরাজি আন্দোলন। বাংলার মুসলমান সমাজকে বিশুদ্ধ ইসলামের ধারায় নিয়ে আসার যে প্রচেষ্টা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শুরু হলো তার একটি পর্ব শেষ হলো পূর্ব পাকিস্তান তৈরিতে।

ইসলাম একটি নির্দিষ্ট ধর্মমত, এতে অন্য কোনো ভাবনা যুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই। আরব দুনিয়ায় বা তুরস্কে কোনো রেনেশাঁস না হলে ইসলামে কোনো মুক্তভাবনার সম্ভাবনা দুরূহ। ইসলাম খুব নির্দিষ্ট ভাবে বলে যে একমাত্র উপাস্য আল্লাহ্, তার কোনো অংশীদার হতে পারে না। হিন্দু শিক্ষিত বাঙালি ইসলাম সম্পর্কে খুব একটা খবর কোনোদিনই রাখে না। ফলে রামকৃষ্ণদেবও তিনদিনের জন্য ইসলামে দীক্ষিত হন বলে প্রচলিত। এটি সত্যি না তাঁর লিবারেল ব্রাহ্ম পার্ষদদের কল্পিত তা আজ জানা মুশকিল। কিন্তু ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়া অতীব সহজ কাজ, ইসলাম ত্যাগ করাটা সহজ নয়। ইসলাম ত্যাগীকে বলা হয় মুর্তাদ এবং এই কাজের শাস্তি মৃত্যু। রামকৃষ্ণদেবকে একথা কেউ বলেছিলেন কিনা তাও জানা দরকার। আরেকটি কথা খুব প্রচলিত— ইসলামের ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম আগমনের পর হিন্দু ধর্মের চর্চার কেন্দ্রগুলি হয় ধ্বংস নয় গুরুত্ব হারানোয় বাংলায় হিন্দু ধর্মের চর্চা রুদ্ধ হয় আচার-বিচারের শৃঙ্খলে। ফলে সমাজে উচ্চ চিন্তাভাবনার অভাব ছিল, জাতপাতের ভেদাভেদ ধর্ম পালনের পথ হয়ে দাঁড়ায়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন— অন্নের বিচারই ধর্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপরই বিশেষরূপ চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। এরকম একটি সমাজে সমতার ভাবনা ফিরিয়ে আনতে ইসলামের সমতার উদাহরণ বিবেকানন্দ-সহ প্রায় সব বাঙালি মহাপুরুষই দিয়েছেন। কিন্তু এতে যে মারাত্মক ভ্রম ছিল তা হলো— ইসলামের ভ্রাতৃত্ব কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্যই। বিশেষত মূর্তিপূজারিদের (যেমন হিন্দুরা) জন্য ঘৃণা ও হিংসাই শুধু রয়েছে ইসলামি শাস্ত্রের ছত্রে ছত্রে। বাংলা ভাগ হওয়া ও তারপর পূর্ব পাকিস্তান/বাংলাদেশ থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দু বিতাড়ন, ইসলামের শিক্ষারই ফল।

পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হবার পর

আশা করা গিয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হবার পর বাঙালি হিন্দু এই ভ্রম থেকে মুক্ত হবে। হিন্দু বাঙালি ১৯০৫-এর বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছিল, সেই হিন্দু বাঙালিই তার নিজের তৈরি বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে উদ্যোগী হলো। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইনসভা ভেঙে তৈরি হলো পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের বাংলাকে বাঁচিয়ে এগোনর জন্য হিন্দুরা বাঙালি পশ্চিমবঙ্গ গঠিত করলো শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। দুটি দশক কিছুটা নীরব থাকার পর ৮০-র দশক থেকেই পশ্চিমবঙ্গে ইসলামের প্রসারণের কাজটি শুরু হয়ে গেল জোর কদমে। কাজটিতে সরাসরি মদত জোগালেন হিন্দু কমিউনিস্টরা, একে নৈতিক সমর্থনের কাজটি করলেন কংগ্রেসিরা। আর ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা যাতে ইসলাম সম্পর্কিত ব্যাপারে কোনোরকম মাথা না ঘামায় সেজন্য 'সর্ব ধর্ম মহান'— এই প্রচার চালিয়ে গেল প্রায় সব হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলি। ফলে কোনো বাধা ছাড়াই ইসলামের বিজয়রথ আবার এগিয়ে চলল পশ্চিমবঙ্গে। এই বিজয় রথের রসদ জুগিয়েছে যারা ও যেভাবে তার একটি ছবি নীচে দেওয়া হলো।

সাংস্কৃতিক শক্তি

ইসলাম প্রসারের জন্য দেশভাগে বিভক্ত পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে জরুরি ছিল ইসলাম বিরোধী সব ধরনের মতামতকে স্তব্ধ করে দেওয়া। ইসলাম প্রসারের কাজটি সর্বভারতীয় স্তরে বামপন্থী সেকুলার ঐতিহাসিকেরা করে গেছেন খুব সুচারু ভাবে। পশ্চিমবাংলায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের মতো ব্যতিক্রম ছাড়া বাকি ঐতিহাসিকেরা মুসলমান শাসকদের সব দোষ লুকোতেই ব্যস্ত থাকেন। ফলে তিতুমিরের মতন একজন জিহাদির নতুন ইতিহাস তৈরি করে তাকে মহাপুরুষ বানানো হয়। বাম শাসনের সময় তিতুমিরের নামে বারাসতের বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে আরো স্মারক স্থাপন হয়েছে। এতে কংগ্রেস কোনো আপত্তি করেনি, এই নামকরণের বিরুদ্ধে বারাসতের হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলি কোনো প্রতিবাদ করেনি। এই মানসিকতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজে পাঠ্য ইতিহাসের বইয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রকৃত ইতিহাস বলাই হয়নি। দেশভাগের পরেও লক্ষ লক্ষ হিন্দুর পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়মিত অত্যাচারিত হয়ে চলে আসবার ইতিহাস কখনো পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের জানবার সুযোগ হয়নি। বাংলাদেশ হবার পরেও আবার লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বিতাড়নের কথা আমাদের সংবাদ মাধ্যম কোনোদিন আলোচনা করেনি। এইভাবে ইসলামি শক্তির অতীতের অত্যাচার থেকে একেবারে সাম্প্রতিক অত্যাচার লুকিয়ে রেখেছে বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক দলগুলি। আর এর বিরুদ্ধে প্রকৃত ইতিহাস প্রচারে বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেয়নি মিশন- সেবাশ্রম-নাথ-সৎসঙ্গ মার্কা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। ফলে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি রমরমার জমি প্রস্তুত হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকেই।

১৯৭৮ সালে সারা ভারতে প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী পদ হয় বামফ্রন্টের পশ্চিমবঙ্গে। স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গকে ইসলামি মৌলবাদ মুক্ত করা যখন লক্ষ্য হবার কথা তখন স্বাধীনতার ৩০ বছর পর ক্ষমতায় এসেই কমিউনিস্টরা ইসলামি শিক্ষার প্রসারে নেমে পড়ল। দিনে দিনে বেড়ে চলল মাদ্রাসার সংখ্যা ও তার জন্য খরচ। জ্যোতি-বুদ্ধ-র এই মাদ্রাসা বাহিনীই তসলিমা নাসরিনের বিতাড়নের জন্য আরবি পোশাক পরে আন্দোলন করতো। ২০১১-তে ক্ষমতায় এসে তৃণমূল সরকার দশ হাজার মাদ্রাসা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। চলছে দিকে দিকে মাদ্রাসা স্থাপনের কাজ। এই হাওয়ায় অননুমোদিত খারিজি মাদ্রাসারাও সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছে। এবছর রাজ্য বাজেটে সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ২৮১৫ কোটি টাকা যা রাজ্যে বৃহৎ-মাঝারি-ক্ষুদ্র শিল্প, পর্যটন ও তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরগুলির মোট বরাদ্দের থেকে বেশি। ইসলামের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী গড়ার কাজ পশ্চিমবঙ্গে চলছে পুরোদমে। খাগড়াগড়ে ইসলামি মৌলবাদীদের বোমা কারখানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মাদ্রাসার নাম।

জনশক্তি-অনুপ্রবেশ

অস্ত্র দিয়ে রাজ্য জয় করার দিন শেষ হয়ে আসায় এখন রাজ্য জয়ের একটি বড় অস্ত্র হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশ। ব্যাপক হিন্দু উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এই সংখ্যা বেড়ে যাবার কথা। কিন্তু ১৯৬১ সালের জনগণনায় দেখা গেল বরং মুসলমান জনসংখ্যা সামান্য বেড়েছে। এর কারণ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানদের অনেকেই ফিরে এসেছেন কিন্তু হিন্দুরা কেউ ফেরেনি। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট শাসনের শুরু থেকেই বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক মুসলমান বাঙালি ভারতে ঢুকতে থাকে। একে সম্পূর্ণভাবে মদত দেয় রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। ফলে ২০১১-র জনগণনায় ২৭ শতাংশ মুসলমান। এখন সম্ভবত প্রায় ৩০ শতাংশ। এর মধ্যে ১০ শতাংশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, বিদেশি। স্বাধীনতার পর শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানরা ভালো চাকরির সুযোগ পাওয়ায় প্রায় সবাই পূর্ব পাকিস্তান চলে যায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কোনো শিক্ষিত আধুনিক নেতা পাবার সম্ভাবনাও খুব কম হয়ে যায়। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোনোরকম আধুনিক চিন্তাভাবনা গড়ে ওঠার কোনো সুযোগ ঘটেনি, এদের নেতারা হচ্ছেন মৌলবাদী ইমাম, পিরেরা। এই নেতাদের নেতৃত্বে বিশাল জনগোষ্ঠী এখন ইসলামের মৌলবাদী চিন্তার কাজগুলি করতে শুরু করেছে জোর কদমে।

রাষ্ট্রীয় শক্তি

সব শক্তি সবচেয়ে জোরালো ও কার্যকরী হয় রাষ্ট্রশক্তির সমর্থন থাকলে। এই রাজ্যে গত চল্লিশ বছর ধরে সিপিএম ও তৃণমূলের সরকারগুলি বিভিন্নভাবে সরাসরি ইসলামি শক্তির সহায়ক হয়ে কাজ করেছে। আর এই সময়ে কেন্দ্রের মূলত কংগ্রেস সরকারও দেশজুড়ে একই ধরনের কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন মুসলমান দুষ্কৃতীরা জানে পুলিশ তাদের কিছু করবে না। বরং প্রয়োজনে তাদের আড়াল করবে। শুরুটা করেছিল সিপিএম। কলকাতার বুকে তসলিমা নাসরিনকে তাড়ানোর দাবিতে সারাদিন ধরে মুসলমান দুষ্কৃতীদের ভাঙচুর-লুটপাটের সময় পুলিশ কিছুই করেনি, পরে সেনা এসে তা সামলায়। এর পরে দেগঙ্গাতেও তিনদিন ধরে মুসলমান দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব থামায় সেনাবাহিনী। তৃণমূল সরকার এসে এটাকে রোজকার ঘটনা বানিয়ে ছেড়েছে। খাগড়াগড়, কালিয়াচক, ভাঙড়— এরকম অনেক ঘটনা এই সত্য দেখিয়ে দিয়েছে। এই শক্তির সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামের পতাকা উড়ছে বীরদর্পে।

বিদেশি শক্তি

ইসলামি মৌলবাদের এরকম উর্বর জমিকে বিদেশি শক্তির ব্যবহার খুব স্বাভাবিক। বাংলাদেশের ইসলামি মৌলবাদী শক্তির শক্ত ঘাঁটি এখন পশ্চিমবঙ্গ। এখানে অস্ত্র কারখানা খুলেছে তারা, এরপর এখান থেকে বিশ্বে জঙ্গি সরবরাহ শুরু হতে সময় লাগবে না। আইসিস থেকে সৌদি আরব— সবার টাকাই ঘুরছে পশ্চিমবঙ্গে। সেজন্য বাংলাদেশের গণহত্যাকারীদের সমর্থনে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ করছে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ।

পশ্চিমবঙ্গ গঠন করে তাহলে কী হলো?

ইসলামিকরণের পথে পশ্চিমবঙ্গ

অমলেশ মিশ্র

এই রাজ্যের ইসলামিকরণের কাজ এখন পূর্ণ উদ্যমে চলছে। এটা কিছু নতুন নয়। সেই অষ্টম শতাব্দী থেকেই বিদেশিরা এই কাজ শুরু করেছিল এবং প্রায় ৯০০ বছর চলেছিল। অ-মুসলমানদের মুসলমান করা এবং অ-ইসলামি দেশকে (দার-উল-হারব) ইসলামি দেশ (দার-উল-ইসলাম) করা ওই রিলিজিয়নের আবশ্যিক কাজের মধ্যে পড়ে। এটা কোনো নতুন তত্ত্ব নয়, ইসলামিকরণ কোনো নতুন কাজও নয়।

নতুন যেটুকু, সেটি হলো— আগে ইসলামিকরণের কাজ করতেন মুসলমানরা। আক্রমণ করে, রাজশক্তি দখল করে রাজশক্তির সহায়তায় এই কাজ করা হোত। রাজশক্তির ইসলামিকরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন তাদের সম্প্রদায়ের নেতারা। এখন ইসলামিকরণের কাজ করছে হিন্দু রাজশক্তি। সঙ্গে আছেন সেই রাজশক্তির আজ্ঞাবহরা, কৃপাধন্যরা, কৃপ্রাপ্রার্থীরা। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা তো আছেনেই। ফলে কাজটা সহজতর হয়েছে।

ইসলামি রাজশক্তি যখন তাদের সম্প্রদায়ের নেতাদের নিয়ে ইসলামিকরণের কাজ করত তখন হিন্দুরাজশক্তি ও হিন্দু জনগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন— নিজেদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবন ও রাজশক্তি রক্ষার জন্য। তাই ৯০০ বছর চেষ্টা করেও দেশটাকে ইসলামি দেশ বানানো যায়নি। প্রতিরোধ ও প্রতিস্পর্ধা হিন্দুদের হিন্দুত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করেছে। তাই দেশটা প্রধানত হিন্দু প্রধান থেকে গেছে। আর এই দেশের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা— বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান হয়ে গেছে। পৃথিবীর বহুদেশ ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেও, হিন্দুদের বীরত্বে এই দেশ ইসলামিক হয়নি এখনও। তবে ১৯৫১ থেকে ২০১১ পর্যন্ত জনগণনার হিসাবের দিকে তাকালে দেখা যাবে— এই ক'বছরে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোনো সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। হিন্দু জনসংখ্যা কমে ৮৪.১ শতাংশ থেকে ৭৯.৮ শতাংশে নেমেছে। আর মুসলমান জনসংখ্যা ৯.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪.২৩ শতাংশ। অর্থাৎ হিন্দু জনসংখ্যা ৫ শতাংশ কমেছে আর মুসলমান জনসংখ্যা ৫ শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ ইসলামিকরণের নতুন পদ্ধতি হলো— মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা— চলতি কথায় পয়দা করে ফয়দা তুলে নেওয়া।

এখন ইসলামিকরণের কাজটা সহজতর হয়েছে। কারণ (১) হিন্দুরা রাজশক্তি ব্যবহার করছে ইসলামের স্বার্থে, (২) হিন্দুরাজশক্তির আজ্ঞাবহরা, কৃপাধন্যরা, কৃপাপ্রার্থীরা— এক কথায় রাজশক্তির আশ্রিতরা ইসলাম সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, (৩) প্রতিস্পর্ধী ও প্রতিরোধী হিন্দুশক্তির একান্ত অভাব— (ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ১২ হাত কাপড় পরেও উলঙ্গ আছে)।

তাহলে পার্থক্যটা এই রকম দাঁড়াল :

আগে : (১) মুসলমানরা রাজশক্তি ব্যবহার করে ইসলামিকরণ করত।

(২) মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা রাজশক্তির সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করত।

(৩) রাজশক্তি নয়, সাম্প্রদায়িক নেতাও নয়, সাধু ফকির, দরবেশের ছদ্মবেশে ইসলামি রাজশক্তির প্রশ্রয়ে ইসলামিকরণের কাজ চলত।

এখন : (১) হিন্দুরাই রাজশক্তি ব্যবহার করছে ইসলামিকরণের কাজে। (পশ্চিমবঙ্গে এটা খুব প্রকট)।

(২) ইসলামি সম্প্রদায়ের নেতারা হিন্দু রাজশক্তির প্রশ্রয়ে ইসলামিকরণে তৎপর আছেন।

(৩) হিন্দুরাজশক্তির আজ্ঞাবহরা, কৃপাধন্যরা ও কৃপাপ্রার্থীরা প্রত্যেকটি হিন্দুবিরোধী কাজে নিয়ত ইসলামি শক্তির সহযোগিতা করছেন।

উদ্দেশ্য :

আগে : (১) পুরো দেশটিকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করা। (২) প্রকাশ্যে লুঠ করা।

এখন : (১) রাজশক্তিতে বহাল থাকার জন্য ভোট সংগ্রহ করা। (২) গোপনে লুঠ করা।

উপায় :

আগে : (১) অ-মুসলমানদের বুকে তরবারি ঠেকিয়ে নির্দেশ— হয় ইসলাম বরণ কর নতুবা মৃত্যুবরণ কর।

(২) পরে আর একটি বিকল্প যুক্ত হয়— যাকে বলা হয় জিম্মি হয়ে থাকা অর্থাৎ কেবল বেঁচে থাকার সুযোগ থাকল মাত্র— অন্য কিছু নয়। আর ইসলাম বিরোধিতার প্রশ্নই উঠে না।

এখন : (১) ধর্মনিরপেক্ষতা যার নির্গলিতার্থ হলো— মুসলমানদের স্বার্থে রাজশক্তি নিজেকে ব্যবহার করবে। হিন্দুরা তাদের সংস্কার, সংস্কৃতি ও সম্পত্তিরক্ষা ও দেবার্চনা প্রভৃতিতে ইসলাম সমর্থন ব্যতীত ব্রতী হতে পারবে না।

(২) একই কর্মে নিযুক্ত হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে একইরকম ব্যবস্থা থাকবে না। ইমামরা সুযোগ পেতে পারেন, পুরোহিতরা তা পাবেন না।

(৩) মুসলমানদের সম্প্রদায়গত যাবতীয় রীতি রেওয়াজ হিন্দু রাজশক্তি

মেনে নেবে কিন্তু ওই নীতি হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না। (এক ধরনের জিম্মি হয়েই থাকতে হবে।)

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো--- মাতৃভূমি বা দেশের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত কোনো মুসলমানকে রাজশক্তিলোভী হিন্দু অক্লেশে এবং প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারেন। ওই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত মুসলমানদের হেমায়েতে ইসলাম তত্ত্বের কারণে এদেশের মুসলমানরা সমর্থন করতে পারেন।

(স্বদেশ-বিদেশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়— কারণ তারা ইসলামিক ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী।)

এদেশের মানুষ হিসেবে তারা এদেশের যাবতীয় সুখ-সুবিধা অধিকার হিসেবে ভোগ করবেন অথচ দেশরক্ষাকে কর্তব্য বলে মনে করবেন না।

ইসলামি কোনো শক্তি (ব্যক্তি বা সমষ্টি) যদি হিন্দু ব্যক্তি বা সমষ্টিকে আক্রমণ করে তবে তা তাদের 'ধর্মীয় বিষয়' বলে বরদাস্ত করতে হবে। মুসলমানদের অন্যায় ও অসংযত কাজের বিরুদ্ধে মাথা তুললে— তা 'সাম্প্রদায়িক' বলে গ্রাহ্য হবে।

মুসলমানরা তিনটির বেশি বিবাহ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে, হিন্দুরা একটির বেশি স্ত্রী রাখতে পারবেন না এবং তার সঙ্গে তাকে পরিবার পরিকল্পনা করতে হবে— যাতে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায়।

ইসলামের সব কিছুকে সমর্থন করাই ধর্মনিরপেক্ষতা। হিন্দু রাজশক্তি, তাদের আজ্ঞাবহরা, কৃপাধন্য ও কৃপাপ্রার্থীরা এই ধর্ম নিরপেক্ষতাই পালন করবেন, রক্ষা করবেন এবং এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবেন। এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ 'সাম্প্রদায়িকতা' হিসেবে বিবেচিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এখন হিন্দু রাজশক্তি ধর্মনিরপেক্ষতার সাধনা ও প্রয়োগ করছেন। এবং যাবতীয় সংবাদমাধ্যম রাজশক্তির কৃপাধন্য ও কৃপাপ্রার্থী হওয়ায় এই রাজশক্তির সেবা করছেন।

পাঠ্যপুস্তকগুলিতে, রাজশক্তির যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগে, অনুদান ও সাহায্য বিতরণে, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে বাধাদানের মাধ্যমে, নানা প্রকার বিধি-নিষেধ প্রবর্তনে, ইসলামি অনুষ্ঠানে ভোট প্রণোদিত হয়ে রাজশক্তির সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে এই ইসলামিকরণের কাজ চলছে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দবন্ধটি নিজের মান-ইজ্জৎ খুইয়ে এই আচরণের ব্যাখ্যায় নিয়োজিত হয়েছে।

একজন মুসলমান যে রাজনৈতিক দলের সাইনবোর্ড ব্যবহার করুন না কেন, তিনি সাম্প্রদায়িক হতে বাধ্য। অন্য কোনো সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করা তার কাছে নিষিদ্ধ। তাই ইসলামি যে-কোনো বিষয়েই সব দলের মুসলমান নেতারা একই কথা বলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শ তার কোনো বাধা হতে পারে না। একই ঘাটে সবাই জল খায়। হিন্দুপ্রধান রাজনৈতিক দলে তাদের অংশগ্রহণ ইসলামিকরণ প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ যার মধ্যে রাজনীতির গন্ধমাত্রও থাকে না। তাই হিন্দুবিরোধী কোনো ইসলামি কর্মে এরা প্রতিবাদ করেন না।

এই বঙ্গে বা ভারতবর্ষে যেসব সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের খবর পাওয়া যায় তা কাশ্মীরে বা খাগড়াগড় যেখানেই হোক, সেটি মুসলমানরাই করে। কিন্তু মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদের কতজন এগুলির নিন্দা করেছেন?

কোরান-হাদিশে প্রত্যেক মুসলমানের পাঁচটি ফর্জ (অবশ্য করণীয় কাজ)-এর উল্লেখ আছে— (১) আল্লা ও তার রসুলে বিশ্বাস, (২) নমাজ, (৩) রোজা, (৪) জাকাত্, (৫) হজ। এগুলি সকলেই জানেন। যেটি সকলে জানেন না অথচ ষষ্ঠ ফর্জ বলা যায়, সেটি হলো— হেমায়েত-এ-ইসলাম। অর্থাৎ একজন মুসলমান সর্বদাই অন্য মুসলমানকে সাহায্য করবেন। কোনো মুসলমান যদি হিন্দু বিরোধিতা করেন, অন্য মুসলমানদের ফর্জ অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কাজ হলো— সেই মুসলমানকে সাহায্য করা।

এটি যদিও ইসলাম সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাসের ব্যাপার তবু এই রাজ্যের হিন্দুপ্রধান রাজশক্তি তাদের আজ্ঞাবহ, কৃপাধন্য ও কৃপাপ্রার্থীরা এই হেমায়েত-এ-ইসলামে বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। কারণ তাদের ঈশ্বর হলেন ভোট এবং তার মাধ্যমে রাজশক্তি ভোগ করা। ফলে এই রাজ্যে ইসলামিকরণ বেশ দ্রুততার সঙ্গেই এগোচ্ছে। প্রতিস্পর্ধী বা প্রতিরোধী হিন্দুশক্তি নির্বিকার রয়েছে। তারা নিশ্চিন্তে বটপাতা খাচ্ছে।

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের আগে শ্রীকৃষ্ণ দেখা করেছিলেন দুর্যোধনের সঙ্গে যাতে যুদ্ধটা এড়িয়ে যাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে ধর্মের কথা বলতে চাইলে দুর্যোধন বলেন যে তিনি জানেন ধর্ম কী এবং আরও জানেন অধর্ম কী। তবু তিনি ধর্মের পথে না গিয়ে অধর্মের পক্ষেই থাকবেন কারণ ধর্মে তাঁর প্রবৃত্তি নাই আর অধর্ম থেকে তিনি নিবৃত্ত হতে পারছেন না।

ধর্মেতে তার প্রবৃত্তি নেই যদিও তিনি জানেন ধর্ম কী। আবার অধর্ম থেকে তাঁর নিবৃত্তি নেই যদিও তিনি জানেন অধর্ম কী।

সকলেই জানেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সবংশে নিহত হয়েছিলেন দুর্যোধন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজশক্তি সাম্প্রদায়িকতা কী এবং ইসলাম তোষণ কী তা জানে কিন্তু নিবৃত্তি নেই। আবার সমদর্শিতা ও নিরপেক্ষতা কী এও জানে কিন্তু প্রবৃত্তি নেই।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

এই সময়

ঐতিহ্যের হস্তান্তর

দিল্লির ঐতিহাসিক রিগাল সিনেমা হল বিক্রি হয়ে গেল। ৩১ মার্চ থেকে রিগাল চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। যে প্রমোটার-সংস্থা হলটি কিনেছে তারা আধুনিক

মাল্টিপ্লেক্স তৈরি করবে। ৮৪ বছর বয়েসি রিগাল তৈরি হয়েছিল ১৯৩২ সালে। অন্যতম মালিক বিশাল চৌধুরি জানান, দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে চলছিল। তাই বিক্রির সিদ্ধান্ত।

ভিটামিনের অভাবে ক্যান্সার

বইটির নাম, ওয়ার্ল্ড উইদাউট ক্যানসার। লেখক জি. এডওয়ার্ড গ্রিফিন। তাঁর অভিমত, ক্যান্সার কোনো রোগ নয়। ভিটামিন বি-১৭-র অভাবই নাকি ক্যান্সারের কারণ। এবং প্রাকৃতিক উপায়ে এর চিকিৎসা সম্ভব। আপেলের বীজ ভিটামিন বি-১৭-র একটি ভালো উৎস। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এর নাম ল্যাইটরাইল।

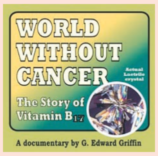

আধারে পরিচয়

এতদিন পরিচয়পত্র বলতে ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড, পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্সকে বোঝাত। যার সুযোগ নিতেন কিছু অসাধু নাগরিক। একাধিক প্যানকার্ড বানিয়ে সহজেই কর ফাঁকি দেওয়া যেত। এই প্রবণতা বন্ধ করতে কেন্দ্র আধার কার্ডকে সরকারি ভাবে স্বীকৃত একমাত্র পরিচয়পত্র হিসেবে ঘোষণা করতে পারে। আপাতত বিষয়টি আলোচনাধীন।

সমাবেশ -সমাচার

পরিবার প্রবোধন সম্মেলন

গত ১৯ মার্চ উত্তরদিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ নগরের পরিবার প্রবোধন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সঙ্ঘ চালক অপূর্ব দাস এবং উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কুটুম্ব প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল। শ্রীপাল তাঁর বক্তব্যে রাষ্ট্র গঠনে মায়েদের অবদানে জীজাবাঈ, মা-সারদা ও নিবেদিতার কথা তুলে ধরেন। হিন্দুজীবন পদ্ধতি, মায়েদের আচার-আচরণের কথা উল্লেখ করেন। পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করতে গিয়ে হিন্দুজীবন পদ্ধতির অবক্ষয় হয়েছে। সনাতন ধর্ম আমাদের উন্নতির একমাত্র পথ। এই বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন। সভা পরিচালনা করেন রায়গঞ্জ নগর পরিবার প্রবোধন সংযোজক মনোরঞ্জন পাল।

বালিবেলা শিশুমন্দিরে রক্তদান শিবির

গত ১৯ মার্চ হুগলী জেলার বালিবেলা সরস্বতী শিশুমন্দিরে রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে রজতজয়ন্তী বর্ষের শুভ সূচনা করলো। অনুষ্ঠানের সভাপতি আরামবাগ নগরের প্রবীণ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রথীনকান্তি মণ্ডল রক্তদানের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন। বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন আরামবাগ মহকুমা কোষাগার আধিকারিক জয়ন্ত হালদার। রক্তদান শিবিরে শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য বিজয়কৃষ্ণ রায় প্রথমে রক্তদান করেন। এরপর আরামবাগ ব্লাড ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধানে ৪ জন আচার্য, ১৫ জন প্রাক্তন ভাই, ১০ জন অভিভাবিকা, ৭ জন অভিভাবক ও ১৪ জন শুভানুধ্যায়ী-সহ মোট ৫১ জন রক্তদান করেন।

অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে খাতড়া ও বাঁকুড়া শহরের পাঞ্চজন্য ভবনে সেবা ভারতীর উদ্যোগে অর্শ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিনা অপারেশনে অল্প খরচে আয়ুর্বেদীয় ইনজেক্শনের মাধ্যমে ৫০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসার পূর্বে ডা: বি কে সাহা রোগীদের সামনে অর্শরোগের কারণ ও তা থেকে সতর্ক হওয়ার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন 'অর্শ' কোনো জীবাণুবাহিত রোগ নয়, সেই জন্য সংক্রামক নয়। এই রোগ থেকে মুক্ত থাকতে হলে ফাস্টফুড ও মাংসাহার বর্জন করতে হবে এবং ফাইবার যুক্ত খাবার ও শাকসবজি খেতে হবে যাতে কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার রামপুরহাট নগরের শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভাত শাখার কার্যবাহ গৌতম পালের মাতৃদেবী গত ৬ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

এই সময়

গারদে ৮০০

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিমধ্যেই অ্যান্টি রোমিও স্কোয়ার্ড গঠন করেছেন। এখনও পর্যন্ত ৮০০ রোমিওকে রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাজ্যপুলিশের ডিজি দলজিৎ চৌধুরি জানিয়েছেন, ধৃতদের প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করবে পুলিশ।

যোগী আদিত্যনাথকে হুমকি

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে হুমকি-চিঠি দিল ইসলামিক

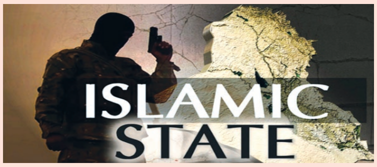

স্টেট। চিঠির শুরুতেই তারা লিখেছে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ!' তারপর মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লেখা হয়েছে, 'পূর্বাঞ্চলে খুব শীগগির ধ্বংসকাণ্ড চালানো হবে। আপনার ক্ষমতা থাকলে আটকান।'

শহিদ স্মরণে

২৩ মার্চ ১৯৩১, তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ভারতের তিন যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। ৮৬ বছর পর

সারা দেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল সেই তিন অসমসাহসী সন্তানকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক টুইটবার্তায় বলেন, ভারত কোনোদিন শহিদ ভগৎ সিংহ, রাজগুরু আর সুখদেবকে ভুলবে না। শহিদ দিবস উপলক্ষে ইন্দোর মিউজিয়ামে বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতীর শিল্পী সমন্বয়ে বাংলা গানের একক অনুষ্ঠান

গত ১৭ মার্চ কলকাতার রামমোহন হলে সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গপ্রান্তের ৩০ বর্ষ পদার্পণ সমারোহের পঞ্চম নিবেদন ছিল বিভিন্ন শাখার শিল্পীদের সমন্বয়ে বাংলা গানের একক অনুষ্ঠান। একটা সুন্দর প্রচেষ্টা। বিভিন্ন শাখা/জেলার শিল্পীদের বহুদিনের প্রত্যাশার সার্থক রূপায়ণ। সংস্কার ভারতী নবীন প্রজন্মের শিল্পীদের, তার শিল্পীসত্তার প্রকাশের সুযোগ করে দিতে চায়। তারই ফল স্বরূপ এদিনের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন শাখার ২৬ জন শিল্পী পরিবেশন করলেন বাংলার বিভিন্ন ধারার গান। পরিবেশিত হলো লোকসঙ্গীত, ভক্তিগীতি, পুরানোদিনের জনপ্রিয় আধুনিক বাংলা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি।

এই বৈচিত্র্যে ভরা বাংলা গানের একক অনুষ্ঠানে বেশ কিছু শিল্পীর কণ্ঠমাধুর্য এবং গায়কির গুণে শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছিল, তেমনি কোনো কোনো শিল্পীর গানে পাওয়া গেল প্রাথমিক জড়তার ভাব। তাই সংস্কার ভারতীর এ ধরনের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও আবার দেখা যাবে, যাতে করে নবীন শিল্পীরা নিজেদের তৈরি করে নিতে পারবেন মঞ্চের পরিবেশের মধ্যে। শিল্পীদের সঙ্গে যথাযথ সহযোগিতা করেছেন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন কাবেরী কর পুইতণ্ডী।

বিবেকানন্দ কেন্দ্রের প্রান্ত বৈঠক

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারী পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের বৈঠক গত ১৮-১৯ মার্চ উত্তর কলকাতার 'দধীচি ভবনে' অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ৬০ জন কার্যকর্তা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। দু'দিন ব্যাপী প্রান্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা প্রবীণ দাভলকর এবং এম হনুমন্তরাও বলেন, 'অধ্যাত্মপ্রাণিত সেবামূলক সংগঠন বিবেকানন্দ কেন্দ্রের লক্ষ্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমর্থ ভারত নির্মাণ।' তিনি কার্যকর্তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা স্থির করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

এবছর প্রান্ত বৈঠকের মূল ভাবনা ছিল— 'মূলে জল সিঞ্চন কর' —অর্থাৎ নিত্য কার্যক্রম ও অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে সংস্কারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। মূল্যবোধ, সংস্কার ও শৃঙ্খলাযুক্ত- মানবসম্পদ নির্মাণ করতে পারলেই লক্ষ্যপূরণ করা যাবে বলে দু-দিনের আলোচনায় কার্যকর্তারা মত প্রকাশ করেন। প্রান্তবৈঠকে আগামী বছরের জন্য নতুন সমিতি ঘোষিত হয়।

এই সময়

রেলের উদ্যোগ

রেলের ভেন্ডাররা প্রায়শই খারাপ খাবার দিয়ে বেশি দাম চান। বারবার এই অভিযোগে বিরক্ত ভারতীয় রেল উদ্যোগী হয়ে খাবারের মূল্যতালিকা প্রকাশ করল। জানা গেছে এবার থেকে নিরামিষ এবং আমিষ ব্রেকফাস্ট নিলে দাম পড়বে যথাক্রমে ৩০ এবং ৩৫ টাকা। লাঞ্চের জন্য লাগবে যথাক্রমে ৫০ এবং ৫৫ টাকা।

শিল্পীর আবেদন

জলের অপচয় এখনই বন্ধ করতে না পারলে পৃথিবী ঘোর দুর্দিনের সম্মুখীন হবে।

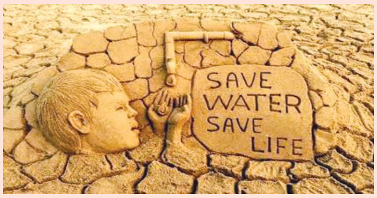

সম্প্রতি জলের জন্য এই আর্তি ফুটে উঠেছে বিখ্যাত বালি-শিল্পী সুদর্শন পট্টনায়কের শিল্পকর্মে। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে নিকাশীনালা-বাহিত বর্জ্য জল সারা বিশ্বের ৮০ শতাংশ পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী।

স্তম্ভে বাগান

ইংরাজিতে বলে, ভার্টিকাল গার্ডেন। বাংলা করলে দাঁড়ায় উল্লম্ব উদ্যান। সহজ কথায় দেওয়ালে বাগান। বেঙ্গালুরুর প্রথম উল্লম্ব উদ্যান তৈরি করা হয়েছে একটি ফ্লাইওভারের

পিলারে। উদ্যোক্তা 'সে ট্রিজ' নামের এক এনজিও। হোসুর রোডের ফ্লাইওভারে গেলেই দেখা যাবে পিলারে ঝোলানো বাগান। উদ্যোক্তাদের দাবি, শহরে বাগান করার জায়গা কমছে। সুতরাং দেওয়ালে বাগান ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় বক্তৃতা

দেশ ও জাতি বিকাশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সকল শাখার মধ্যে সমন্বয় অত্যন্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে রমন সেন্টার ফর এপ্লায়েড অ্যান্ড ইনটার-ডিসিপ্লিনারি সায়েনসেস্ সম্প্রতি রাজারহাটে এমিটি ইউনিভার্সিটি অডিটরিয়মে ড. সুশীল মুখার্জী অ্যান্ড ড. কৃষ্ণকামিনী-(আর)-মুখার্জী অ্যানুয়াল (৪র্থ) এনভাওমেন্ট লেকচারের আয়োজন করে। পরাধীন দেশে এই বিজ্ঞানী দম্পতি ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান গবেষণার ধারাকে উন্নীত করেন— অনুষ্ঠানের সূচনায় তা স্মরণ করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল অধ্যাপক তথাগত রায়। বিষয় : মেট্রো কনস্ট্রাকসন্ ইন কলকাতা অ্যান্ড আদার সিটিজ। অধ্যাপক রায় তাঁর কর্মজীবনে মেট্রোরেল প্রতিষ্ঠার কথা সরসতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রসায়ন বিজ্ঞানী ও জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক মঞ্চের সদস্য ড. কুণাল ঘোষ।

শিবপুরে দোলপূর্ণিমায় নগর সংকীর্তন

প্রতি বৎসরের মতো এই বৎসরেও হাওড়া, শিবপুরস্থ কেশবচন্দ্র স্মৃতি ভবন থেকে দোল পূর্ণিমার দিন প্রভাতে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদের' পরিচালনায় চৈতন্যরথ নিয়ে হরিনাম সংকীর্তন সহকারে নগর পরিভ্রমণ করা হয়। সংকীর্তনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রক্ষিত, হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জিত দে, তপন কুণ্ডু, স্বপন নাগ, তপন নাগ, কাঞ্চন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মঙ্গলনিধি

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক নগর সেবা প্রমুখ তথা বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সদস্য শমিত মণ্ডলের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর পিতা নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্তের হাতে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন। সমাজ সেবা ভারতীর প্রবীণ প্রচারক সনৎ বসু মল্লিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ২১ মার্চ দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার শক্তিপুর খণ্ডকার্যবাহ সন্দীপ দত্তের ছোট কন্যা ঋদ্ধিমা'র মুখেভাত অনুষ্ঠানে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন তাঁর মা এবং শাশুড়িমা জেলা কার্যকারিণীর সদস্য জয়দেব মণ্ডলের হাতে। অনুষ্ঠানে জেলার বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি মালদা জেলার বিনকাঞ্চন শাখার স্বয়ংসেবক তথা ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের জেলা-সহ সম্পাদক গুপ্তেশ্বর চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গোত্রী চৌধুরীর শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁর ঠাকুর্দা শিবপূজন চৌধুরী মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন মালদা বিভাগ সম্পর্ক-প্রমুখ নির্মল কুমার নাথের হাতে। অনুষ্ঠানে গাজোল মহকুমা সঙ্ঘচালক বাদল রায়-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

* * *

গত ১৫ মার্চ মালদা জেলার শোমঘাট শাখার স্বয়ংসেবক দেবব্রত রায়ের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর গ্রামের বাড়িতে তাঁর বড় দাদা কলকাতা মহানগরের দক্ষিণ বিভাগ কার্যবাহ সুব্রত রায় ও মা শান্তিময়ী রায় মঙ্গলনিধি প্রদান করেন মালদা বিভাগ সম্পর্ক প্রমুখ নির্মল কুমার নাথের হাতে। অনুষ্ঠানে বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে মুসলমান সমাজকে

অতিথি কলম

রামিশ সিদ্দিকি

দুর্ভাগ্যের হলেও ঘটনা হলো ভারতের উন্নয়নের জন্য মুসলমান সমাজের কোনো সদর্থক ভূমিকা চোখে পড়েনি। কেননা এই দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে তারা নিজেদের যুক্ত করতে পারছে না। নিজেদের সমাজের ব্যর্থ নেতৃত্বের ফলে তারা আজ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বঞ্চিত সমাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এরই সুযোগ নিয়ে এদেশের কংগ্রেস-সহ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও বামপন্থী দলগুলি এদের মানুষ হিসেবে নয়, ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করছে। লেখক জাপানের উদাহরণ তুলে ধরে দেখিয়েছেন, নিজেদেরকে সংখ্যালঘু নয়, দেশের সুসন্তান হিসেবে মনে করে সঠিক দিশায় এগিয়ে যেতে হবে।

—সম্পাদক, স্বস্তিকা

সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে ভারতীয় জনতাপার্টি এমন ঐতিহাসিক জয় পেয়েছে, যা বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতরাও ভাবতে পারেননি। সংসদে ৮০ জন সাংসদ পাঠাতে পারে সেই উত্তরপ্রদেশে থেকে একজনও মুসলমান সাংসদ নেই এবং সদ্য অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলে একজন মুসলমান বিধায়কও নেই। ভারতীয় জনতাপার্টি একজন মুসলমান প্রার্থীকেও টিকিট দেয়নি। মন্ত্রীসভায় অবশ্য একজন মুসলমানকে স্থান দেওয়া হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার পরে ভারতেই পৃথিবীর সবচাইতে বেশি মুসলমান বাস করেন। এরা ১৯৪৭ সালে মজহবের নামে ভাগ হওয়া পাকিস্তানে চলে যাওয়ার বিরোধী ছিল এবং ভারতকে নিজের মাতৃভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হলো, ভারতের উন্নয়নের জন্য এদের কোনো সদর্থক ভূমিকা চোখে পড়েনি। তারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বঞ্চিত সমাজ হয়ে থেকে গিয়েছে। এই দেশে মুসলমান সমাজের ইতিহাস, পরম্পরা এবং অন্য দিকগুলি যদি তারা ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারতো তবে দেশগঠনে তারাও বড় ভূমিকা পালন করতে পারতো। কিন্তু এরকম হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব সঠিক দিশায় আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

ড. থিয়োডরপল রাইট জুনিয়র আমেরিকার একজন বিখ্যাত শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ভারতের মুসলমানদের বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত পত্রপত্রিকাতে তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ভারতের মুসলমানদের মূলত দু'টি বড় শ্রেণীতে ভাগ করছেন। এক, উপকূলবর্তীয় মুসলমান এবং দুই, অভ্যন্তরস্থ মুসলমান। উপকূলবর্তীয়দের তিনি ব্যবসায়ী বলেছেন। এরা কম দাঙ্গার শিকার হয়েছে। অভ্যন্তরস্থ মুসলমানরা দাড়ি, টুপি ইত্যাদি মজহবি চিহ্নে নিজেদের চিহ্নিত করে থাকে। তারা লালকেল্লা ও তাজমহলের স্মৃতিতে ডুবে থাকে। তারা ভুলতে রাজি নয় যে একসময় এই দেশ মুসলমানদের শাসনে ছিল। আসল কথা হলো, এই দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে তারা নিজেদের যুক্ত করতে পারছে না। তার কারণ তাদের মনের মধ্যে ভাবনা বদ্ধমূল রয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষরা সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ায় রাজত্ব করেছে। আসলে ভারতের মুসলমানরা আরবকে তাদের পিতৃভূমি বলে ধরে নিয়ে বড় ভুল করে বসেছে। এই ভাবনাই তাদের ভারতের ভবিষ্যৎ নির্মাণে বাধারূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই সমাজের ব্যর্থ নেতৃত্ব তাদের এত দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে তারা পিছনের সারিতে থেকে গিয়ে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হয়েই রয়ে গিয়েছে। মুসলমান নেতৃত্ব তাদের সমাজকে যেদিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাতে কেবল

আজ ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেশের মুসলমানদের একটি সুযোগ দিয়েছে। তাদের আত্মমন্থন করে নেতিবাচক ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে সঠিক দিশায় এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হবে মুলমান সমাজ বঞ্চিত— এই মনোভাব ত্যাগ করা। তাদের বুঝতে হবে যে, তারা সংখ্যালঘু নয়, মনেপ্রাণে মানতে হবে তারাও এই দেশের সুসন্তান। তারা রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক এই ভাবনা সবার আগে ত্যাগ করতে হবে।

তাদের মানসিকতাই হতাশার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আজ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও ব্যবসার মতো ক্ষেত্রগুলিতে মুসলমান সমাজ শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে কেন? তাদের সাংসদ বিধায়ক কম— এজন্য কি?

ইতিহাসে এমন বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে শেষ হয়ে যাওয়া কোনো সমাজ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। মুসলমান সমাজকে এরকম উদাহরণ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আধুনিক ইতিহাসে জাপান এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। জাপানের লোকেরা নিজেদের সূর্যের সন্ততি বলে মনে করে। তারা মনে করতো সমস্ত দেশের ওপর প্রভুত্ব করার জন্যই তারা জন্মেছে। এই ভাবনায় জাপান ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে এক আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী দেশ হিসেবে উঠে আসে এবং ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুনের ওপর প্রভুত্ব কায়েম করে। সে সময় জাপানি স্লোগান ছিল— 'পূর্ব এশিয়া জাপানের'। আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বর্ষণ করার পর অপমানজনক আত্মসমর্পণ ছাড়া তাদের সামনে কোনো রাস্তা ছিল না। ১৯৪৫ সালে ১৪ আগস্ট জাপানের রাজা হিরোহিতো যখন রেডিয়োতে আত্মসমর্পণের ঘোষণা করছিলেন তখন জাপানের সেনাবাহিনী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল এই ঘোষণায় জাপানের গৌরব ধুলোয় মিশে যাবে। জাপানের বড় বড় সেনা-আধিকারিকের আত্মহত্যা সত্ত্বেও রাজা হিরোহিতো ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। আমেরিকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও জাপান দেশবাসীকে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষিত করে দেশকে পুনরুত্থানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া দেশ ৩০ বছরের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে চলে আসে। এমনকী আমেরিকার বাজারও জাপানি জিনিসপত্রে ভরে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার চাপানো ঋণ সত্ত্বেও জাপান আজ আমেরিকায় ১২৮০ কোটি ডলারের সামগ্রী রপ্তানি করে। তুলনায় আমেরিকা থেকে জাপানের আমদানি ৬৭০ কোটি ডলারের। বর্তমানে আমেরিকা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় ঋণ গ্রহণকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। আমেরিকার ঘাড়ে ঋণের বোঝা এখন ২০০০ কোটি ডলারের বেশি। অপরদিকে জাপান এখন মহাজনের ভূমিকায়।

পৃথিবীতে তাঁরাই আলাদা কিছু করতে পারেন যাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে পারেন। মুসলমান সমাজেও এমন উদাহরণ হজরত মহম্মদের জীবনে পাওয়া যায়। তিনি তাঁর সহযোগীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে এক সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি মহম্মদ সাহেবের মিশনের এক নির্ণায়ক মোড় প্রমাণিত হয়েছিল। জাপান পরমাণু বোমার আঘাত সহ্য করেছে, লক্ষ লক্ষ দেশবাসীকে হারিয়েছে কিন্তু প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুনে না জ্বলে নিজেদের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সারিতে পা রেখেছে।

আজ ভারতের পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেশের মুসলমানদের একটি সুযোগ দিয়েছে। তাদের আত্মমন্থন করে নেতিবাচক ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে সঠিক দিশায় এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য প্রথম পদক্ষেপ হবে মুলমান সমাজ বঞ্চিত— এই মনোভাব ত্যাগ করা। তাদের বুঝতে হবে যে, তারা সংখ্যালঘু নয়, মনেপ্রাণে মানতে হবে তারাও এই দেশের সুসন্তান। তারা রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক এই ভাবনা সবার আগে ত্যাগ করতে হবে। আজ মানবসম্পদ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। একথা ভাবলে চলবে না যে, তাদের কতজন সাংসদ অথবা বিধায়ক রয়েছেন। উন্নতির মানদণ্ড রাজনীতি নয়; শিক্ষা। এটা দেখা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতার পরে মুসলমান সমাজের কত ছেলেমেয়ে যথার্থ শিক্ষিত হয়েছে। এর জবাব যদি শূন্য হয় তাহলে মুসলমান সমাজের নেতৃত্বকে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি না করে উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(লেখক একজন ইসলাম বিশেষজ্ঞ)

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যা (১৪২৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ
অনুষ্ঠান ১৪ই এপ্রিল, ২০১৭, শুক্রবার
সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে।
স্থান :— কেশব ভবন
৯-এ, অভেদানন্দ রোড, কলকাতা-৬
সবার আমন্ত্রণ

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ : শ্রীজাতর কবিতা

কবিতা লিখলেই কেউ কবি হয়ে যান না। আবার কারও কবিত্বশক্তি থাকলেই তিনি যে কবিতা লিখবেন তার কোনো মানে নেই। সেই কারণেই জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।'

আমার এই গৌরচন্দ্রিকার উদ্দেশ্য সম্প্রতি ফেসবুকে প্রকাশিত কবিতা নামধারী একটি লেখা। লেখক শ্রীজাত। আমার প্রশ্ন, লেখাটিকে কবিতা বলব কেন? এ তো ব্যক্তিগত আক্রোশ। অস্তিত্বের সঙ্কটে ভোগা একজন মানুষের আত্মবিলাপও বলা চলে। একদা একটি আলাপচারিতায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, কবির কাজ সময়কে চিহ্নিত করা এবং সেই চিহ্নিত সময়কে পেরিয়ে যাওয়া। শ্রীজাতর কবিতায় সেই কালমনস্কতার ভারী অভাব। তার কবিতা বড়ো বেশি দক্ষিণের বারান্দা, খোলা চুল আর কফির কাপের উষ্ণতানির্ভর। পড়ামাত্র তিনি ফুরিয়ে যান। ফেসবুকের কবিতাটিও ফুরিয়ে যাবে।

শ্রীজাতর লেখায় অনেকেই আহত হয়েছেন। প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেছে সোশাল মিডিয়ায়। শিলিগুড়ি থানায় একটি এফ আই আরও হয়েছে। আমি এদের প্রত্যেকের ভাবাবেগকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ, অযথা বেশি গুরুত্ব দেবেন না। বাংলা সাহিত্যে এরকম বহু কবি-লেখক আছেন যাঁরা একসময় রাজনীতির হাত ধরে খবরের শিরোনাম হয়ে থাকতেন। তাঁদের সামনে পিছনে জয়ধ্বনি দিত স্তাবকেরা। কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় পাশ করতে না পেরে তাঁদের অনেকেই এখন হতমান। উপেক্ষার অন্ধকারে নির্বাসিত। সময় হলে সময় নিজেই এরকম আবর্জনা মুছে দেয়। শ্রীজাত নিজেও সেটা জানেন। তাই পালটিঘর খুঁজে বেড়ান। কখনও গান লেখেন, কখনও নিজেই গানে সুর দেন। কিছুদিন আগে একটি চিত্রনাট্য লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কোনো প্রযোজক পাওয়া যায়নি। নানারকম চেষ্টা করেও তিনি থিতু হবার জায়গাটা পাচ্ছেন না। সেই ক্ষোভই ফুটে উঠছে তার সাম্প্রতিক লেখায়। যোগী আদিত্যনাথ উপলক্ষ্য মাত্র।

—**সুমন দত্ত,**
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

মমতার সেরা জোকস্

আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বিংশ শতাব্দীর সেরা ঐতিহাসিক জোক্স করলেন চাষিদের সঙ্গে। আলু তোলার শেষ মুহূর্তে সরকারি স্তরে আলু কেনার সিদ্ধান্ত জানিয়ে। এর ফলে সমস্ত চাষির মৃতদেহের কফিনে শেষ পেরেকটি মারা হয়ে গেল। সিদ্ধান্তটি এই— কুইন্টাল প্রতি ৪৬০ টাকা করে ২৮ লক্ষ মেট্রিকটন আলু কেনার। এই ৪৬০ টাকা দামটি তিনি কীভাবে নির্ধারণ করলেন তা বোঝা মুশকিল। অবশ্য ৪৬০ টাকা নিয়ে চাষিদের কোনোরূপ মাথাব্যথা নেই। কেননা কোনো চাষিই কোথাও এক প্যাকেট আলু বেচার সুযোগ পাবেন না। সিপিএম-এর আমলে একবার এইরকম হয়েছিল, আমরা একদিন সামান্য কিছু কেনা দেখেছিলাম, কিন্তু আমাদের মতো চাষিরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আসলে তো আপনার লোকজনেরা পালক-সহ গোটা মুরগিটিই গিলে ফেললো— কিছুই ফেললো না!

কী ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্য তা বোঝার মতো মানসিকতাই বোধ হয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেই। আপনার পার্শ্বচরদের কথামতো তলে তলে কী ভয়ঙ্কর জায়গায় আপনি পৌঁছে গেছেন বুঝতেও পারছেন না। যে সিদ্ধান্তগুলো আপনাকে সমাধিস্থ করছে সেগুলো একটু বলি—

প্রথমত, নোট বাতিল নিয়ে কী কাণ্ডটাই না করলেন! মাঝখান থেকে আপনার টালির ঘরটাও মেরামত করা হলো না— কেন হলো না জানতে বড়ই ইচ্ছে করে। ওই সময় যাদের সহযোগিতা আপনি পেয়েছিলেন তারা (অখিলেশ, রাহুল, বহেনজি)) সবাই হাওয়া হয়ে গেল। এমনকী আপনার একজন এমএলএ মণিপুরে হয়েছিল--- সেও বিজেপি-তে চলে গেল। দ্বিতীয়ত, ৪৬০ টাকা কুইন্টাল দরে আলু কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে চাষি দরদি সাজতে চাইলেন। আপনি কি জানেন কটা চাষির ঘরে আর আলু আছে? তৃতীয়ত, ট্রান্সপোর্টেশন-এর ওপর ভরতুকি। আপনি কি জানেন আমাদের আলু তামিলনাড়ু যেতে যেতে পচে যায় আর ওই আলু বিদেশে কি করে যাবে? অবাক আপনার পরিকল্পনা! হ্যাঁ সমস্যাটা একটু সমাধান হোত যদি সাহস করে ওই ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনে সমুদ্রের জলে ফেলতে পারতেন।

আপনাকে সাবধান করার স্পর্ধা আমার নেই, তবুও বলি এই সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে যত তাড়াতাড়ি হাত গোটাবেন ততই মঙ্গল।

—**মনতোষ বসু,**
কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া।

বিজেপির ইউপি জয়ের সাতটি কারণ

বিজেপি আরও একবার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করল। আরও একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমাণ করলেন এই মুহূর্তে তিনিই দেশের অবিসংবাদী নেতা। বস্তুত উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে যা আশা করা গিয়েছিল তার থেকে অনেক ভালো করেছে বিজেপি। যদিও বিজেপির সভাপতি অমিত শাহ অনেক আগেই ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দল উত্তরপ্রদেশে যে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি বিধানসভা নির্বাচনেও করা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছিলেন। ঠিক কী কারণে বিজেপির এই সাফল্য তা খতিয়ে দেখলে মোটামুটি সাতটি কারণ পাওয়া যাচ্ছে। বস্তুত যা বিজেপিকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে।

▯ প্রার্থীদের টিকিট বিতরণের ক্ষেত্রে

খুবই বাস্তবানুগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মুলায়ম-অখিলেশ জমানায় প্রাধান্য ছিল যাদব গোষ্ঠীর। পিছিয়ে পড়ছিলেন অন্য জনজাতিভুক্ত মানুষেরা। ক্ষোভ বাড়ছিল তাদের মধ্যে। এবারের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী তালিকায় ১৩০ জন ছিলেন অন্যান্য জনজাতিভুক্ত মানুষ।

■ এবারে বিজেপির লক্ষ্যই ছিল যাদব গোষ্ঠীকে যথাসম্ভব বাইরে রেখে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসা। বিশেষ করে জাসি এবং ধোবিদের। সেই লক্ষ্যেই, অমিত শাহের নির্দেশে কুশওয়া সম্প্রদায়ের নেতা কেশব মৌর্য্যকে দলের রাজ্য- সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

■ বহুজন সমাজ পার্টির নেতা স্বামীপ্রসাদ মৌর্য এবং আর. কে. চৌধুরী দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তাতে দলের লাভ হয়। এই দুই নেতাকে হারিয়ে মায়াবতীর দল হয়ে দাঁড়ায় কার্যত জাঠ সম্প্রদায়ের দল। মণ্ডল রাজনীতির ধারক বাহক মায়াবতীর এই উচ্চবর্ণের সঙ্গে দহরম-মহরম মেনে নেননি ভোটাররা। অখিলেশ যাদবের মাত্রাতিরিক্ত যাদব-নির্ভরতাও সমাজবাদী পার্টিকে ডুবিয়েছে।

■ নির্বাচনের অনেক আগে থেকে বিজেপি নোটবন্দি এবং সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের উদাহরণ সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সিদ্ধান্ত নেবার সাহস এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার সদিচ্ছার কথা মানুষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। সেইসঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর গরিব-দরদি ভাবমূর্তি তৈরিতেও সক্ষম হয়েছে দল।

■ কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি উজালার দ্রুত বাস্তবায়ন, শৌচালয়ের জন্য অনুদান এবং ইউরিয়া সারের পর্যাপ্ত জোগানও বিজেপিকে সাহায্য করেছে। এছাড়া কৃষিঋণ মকুব এবং সুদবিহীন ঋণ প্রকল্পও বিজেপিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

■ অখিলেশ সরকারের মাত্রাতিরিক্ত যাদব ও মুসলমান তোষণ সাধারণ মানুষকে সমাজবাদী পার্টির প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। কতকটা সেই কথা মাথায় রেখে মোদী ও অমিত শাহ বৈষম্যহীন প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বিশেষ করে সরকারি রোজগার প্রকল্পগুলিতে এবং এফআইআর-এ।

■ এবারের নির্বাচনে বিজেপি কোনো মুসলমান প্রার্থী দেয়নি। সাধারণ মানুষের কাছে যা বিজেপিকে সর্বার্থে হিন্দুত্ববাদী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিশেষ করে অন্য দলগুলির তোষণমূলক রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্টই ব্যতিক্রমী বলে মনে করেছেন সাধারণ মানুষ।

—**সমীরণ কর,**
বাঁশবেড়িয়া, হুগলী।

রেশন কার্ড না ফ্যাশন কার্ড!

নাগরিকদের খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানি কমমূল্যে দেওয়ার ব্যাপারে রেশন কার্ডের বিতরণ সম্পর্কে রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জেলায় প্রহসন চলছে। কার্ড বিতরণের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেটা অজ্ঞতারই পরিচায়ক। কার্ডের ব্যাপারে সেই পরিবারের আয়ের কোনোরকম অনুসন্ধান না করে বিলি করা হয়েছে। রেশন দোকানের মাধ্যমে ডিজিটালাইজড্ করার পর আবারও একটি ফর্ম পূরণ করা। রেশন কার্ড হোল্ডারদের এই হয়রানি কি পূর্বপরিকল্পিত? এই কার্ড বিতরণের ব্যাপারেও রাজনীতি করা হয়েছে বলে বিরোধীদের মত। এই কার্ডগুলি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে না দিয়ে কি প্রত্যেক রেশন দোকানের মাধ্যমে বিলি করা যেত না? রেশন কার্ডের ছোট বড় পরিবর্তন করা হলেও তার মধ্যে বহু ভুলভ্রান্তি হয়েছে। যেমন ওয়ার্ড ভুল, নামের পদবিতেও ভুল এইসব।

দ্বিতীয়ত, এই রেশনকার্ড প্রথম থেকেই বিলির ব্যাপারে কোনোপ্রকার প্রচার করা হয়নি। ওয়ার্ড থেকেই বিলির পর সেই কার্ড শাসকশ্রেণীর অধীন পুরসভায় ফেরত যাবে কেন? সেই পৌরসভার এলাকার বাসিন্দাদের সংবাদপত্রমাধ্যমে বা স্থানীয়ভাবে প্রচারের মাধ্যমে জানানো হয়নি। যদি তা করা হোত তাহলে নাগরিকগদের কার্ড পৌরসভায় ফেরত যেত না। এরপর নাকি আবারও নতুন করে ফর্ম ফিলাপ করতে হবে। খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করবেন। যারা কার্ড পাননি তাদের দেওয়া হবে ফর্ম। সেটা পুরণ করে আবার জমা দিতে হবে। তাতে আবার নামের বানানে, ওয়ার্ডের, পদবিতে, ঠিকানায় ভুল যে থাকবেই একথা হলফ করে বলা যায়। তার মানে আরও একবার সমীক্ষা, আরও একবার ফর্ম পূরণ করা চলতেই থাকবে তুঘলকি কারবারের মতো। নাগরিকদের নিয়ে খাদ্য দপ্তরের এইরূপ ধাস্টামো করা মোটেই উচিৎ নয়। খাদ্যদপ্তরের অধীনে যাবতীয় খাদ্যের মানতো কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। তাহলে তার বিলি বণ্টন ব্যবস্থায় এতো অরাজকতা কেন?

—**দেবপ্রসাদ সরকার,**
মেমারী, বর্ধমান।

হলদিঘাটের যুদ্ধ ছিল অমীমাংসিত

সাধারণভাবে ইতিহাসে পড়ানো হয়, হলদিঘাটের যুদ্ধে মহান দেশপ্রেমিক রাণাপ্রতাপ পরাজিত হন। কিন্তু ঘটনা প্রবাহ বলছে, এই যুদ্ধের পর আকবর রাণাপ্রতাপের বিরুদ্ধে বার বার যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া হলদিঘাটের ফলাফল সম্রাট আকবরকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাই মানসিংহ ও আসফ খাঁর দরবারে যাওয়া কিছু দিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন।

উপরোক্ত তথ্য বলছে, যুদ্ধে কেউই জয়ী বা পরাজিত হননি। তাই রাণাপ্রতাপকে পরাজিত বলার কোনো অর্থ হয় না। প্রতাপকে পরাজিত বলার নেপথ্যে ছিল বা আছে তৎকালীন ও বর্তমান একশ্রেণীর ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতিত্ব বা জয়-পরাজয় ছাড়া অন্য ধারণার অভাব। যুদ্ধের ফলাফল যে অমীমাংসিত হতে পারে এরূপ ধারণার অভাব। তাই হলদিঘাটের যুদ্ধকে অমীমাংসিত বলাই হবে ইতিহাসসম্মত।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

পরম্পরা

রামনবমী ও শ্রীরামজন্মভূমি

রূপশ্রী দত্ত

রামনবমী বসন্তকালের অন্যতম প্রধান হিন্দুধর্মোৎসব। এই পুণ্যদিবসটি রামের জন্মতিথি। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ রামনবমী তিথি। শ্রীরামকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার বলা হয়।

এই দিনটিতে ভক্তেরা রাম-কথা আবৃত্তি ও রাম-জীবনী রামায়ণ পাঠ করেন। মন্দিরে কিংবা নিজগৃহে তাঁরা জপ, ধ্যান, পূজা করেন। কেউ কেউ পূজারতির অঙ্গস্বরূপ শিশু রামের মূর্তি গড়েন। অঙ্গধৌতির পর নববস্ত্র পরিধান করান। দোলনাতেও সেই মূর্তিকে শয়ন করান। ভক্তমণ্ডলীর সমবেত ভোজন সমাপ্ত হয়।

রামের জন্মস্থান অযোধ্যানগরীতে এই উৎসবের প্রাধান্য দেখা যায়। এছাড়া বিহার, তেলেঙ্গানা, নেপালেও রামনবমী পালিত হয়। এই দিনে শোভাযাত্রার মতো মিছিল ও মধ্যস্থলে রথের উপর রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তি স্থাপন করে সেটি চালানো হয়। ভক্তেরা ভক্তিভরে অযোধ্যার সরযূ নদীতে স্নান করেন। ব্রত-উপবাসের দ্বারা নিজেদের পরিশুদ্ধ করেন।

শ্রীরাম-জন্মভূমি একটি ঐতিহাসিক পটভূমি আছে। উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্য একদা মৃগয়াবিহারে বেরিয়েছিলেন। ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ পরে তিনি অযোধ্যার সরযূ নদীতীরে একটি আম্রবৃক্ষের নীচে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। পরিপূর্ণ রাজ্যপাট তাঁর। নবরত্নের দীপ্তিতে সর্বদাই আলো হয়ে আছে তাঁর রাজসভা। মধ্যমণি কালিদাস। অভিধান অমরকোষ রচয়িতা অমরনাথ। বিখ্যাত জ্যোতিষী ক্ষপণক, চিকিৎসাবিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধন্বন্তরী; ব্যাকরণবিদ ও বহুভাষা-অভিজ্ঞ বররুচি, বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে সুনিপুণ ঘটকর্পর, ভুগোল বিশেষজ্ঞ শঙ্কু ও তন্ত্রবিদ্যা ও গুহ্যবিদ্যাবিশারদ বেতালভট্ট।

হঠাৎ ও কী? সরযূর তীরে ওই ব্যক্তি কে? ঘোর কৃষ্ণকায়, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পমাল্য শোভিত— এমনকী তাঁর অশ্বটিও কৃষ্ণবর্ণ। অশ্ব-সহ সেই ব্যক্তি ডুব দিলেন সরযূ নদীর জলে। বিস্মিত, বিস্ফারিত চক্ষে বিক্রমাদিত্য দেখলেন, ডুব দিয়ে ওঠার পর, যেন জাদুমন্ত্রে সেই ব্যক্তি শ্বেতবস্ত্র পরিহিত, শ্বেতপুষ্পমাল্য শোভিত, শুভ্র গাত্রবর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর অশ্বটিও তখন শ্বেতবর্ণ। বিক্রমাদিত্য প্রবল বিস্ময়ের বশবর্তী হয়ে সেই ব্যক্তির দিকে অগ্রসর হলেন। সন্নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— 'হে কুমার, কোন্ জাদুমন্ত্রে আপনি সরযূতে এক ডুব দিয়ে আপনার আকৃতির এই সর্বাঙ্গীণ সুন্দর পরিবর্তনে সক্ষম হলেন?' দিব্যপুরুষ বিক্রমাদিত্যকে পর্যবেক্ষণ করে বললেন— 'তার আগে আপনি আত্মপরিচয় প্রদান করুন।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আমি মহারাজ গন্ধর্ব সেনের পুত্র। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি রাজ্যত্যাগ করে গুরুমহারাজের আশ্রমনিবাসী হয়েছেন। তাই আমিই উজ্জয়িনীর রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেছি।' এইবার দিব্যকান্তি পুরুষ বললেন— 'আমি তীর্থরাজ প্রয়াগ। আমার জলে আপামর জনতা স্নান করে। তাদের পাপরাশিতে আমি কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হই। এই সরযূতে স্নান করেই আমি সেই পাপমুক্ত হই। সেই পাপ ভস্মে পরিণত হয়ে নদীর জলে অণু-পরমাণু হয়ে মেশে। মাছেরা সেই জলে বেড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ওই মৎস্য-ভক্ষণকারীদের মধ্যেই সেই পাপ সঞ্চারিত হয়। সরযূর মৎস্য ভক্ষণ আর নিজের শরীরে পাপগ্রহণ একই কথা। হে রাজন, আপনি রাম-জন্মভূমি আবিষ্কার করুন। বহু বর্ষ ধরে এখানে রামবৃক্ষ নামে এক প্রাচীন বৃক্ষ আছে। তার এক মাইল পশ্চিমে আছে মণিপর্বত। সেখান থেকে ৫০০ ফুট দূরে আছে 'বায়ব্যকোণম্' নামক স্থান। সেটিই পবিত্র রাম-জন্মস্থান।'

ঘটনাচক্রে সেই দিনটিই ছিল রামের জন্মতিথি পুণ্য রামনবমী। এই দিনেই, বিক্রমাদিত্য তীর্থরাজ প্রয়াগের পথনির্দেশ অনুসরণ করে রামজন্মভূমি আবিষ্কার করলেন। এইভাবে রামনবমী দিনটিতে আর একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য্য আরোপিত হলো।

এই রামনবমী তিথি 'আদ্যানবমী' নামেও পরিচিত। আদ্যামায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুণ্যদিনেই অন্নদাঠাকুর ইডেনগার্ডেন-সংলগ্ন পুষ্করিণী থেকে আদ্যামূর্তি উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে, মায়ের স্বপ্নাদেশে, এই মূর্তির আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং সেই চিত্র সর্বত্র পূজিত হয়। আসল মূর্তিটি বিসর্জিত হয়।

এই দুই আবিষ্কারের মহিমায় এই রামনবমী তিথি গৌরবান্বিত। ■

এই রাষ্ট্র হিন্দু রাষ্ট্র : ডাঃ হেডগেওয়ার

প্রণয় রায়

"লোকে বলে বর্তমান সময় সবচেয়ে খারাপ ও সঙ্কটময়। আমাদের প্রাণপণে কাজ করবার এই সুবর্ণ সুযোগ। এই রকম অনুকূল পরিস্থিতি ইতিপূর্বে কখনও আসেনি, ভবিষ্যতেও আসবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। যেটুকু কাজ করতে হবে এই সময় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেটা করে নাও। ভবিষ্যতে হয়তো কোনো কিছুই করা সম্ভব হবে না। সমস্ত পৃথিবী ঝড়ের গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা যদি পিছিয়ে থাকি তবে চলবে কী করে? এইরূপ বৃথা ভয় করিও না যে পরিস্থিতি কঠিন। সামনে এগিয়ে যাও। প্রতিকূল পরিস্থিতি দিকে না তাকিয়ে যে কেবল কাজ করে যায় সেই বিজয়ী হয় এবং পৃথিবীতে তাদের নাম হয়। তোমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? আমাদের কাজ ঈশ্বরীয় কাজ। ভগবান ও মহাপুরুষদের আশীর্বাদ আমাদের উপর আছে। আমরা নিরন্তর সফলতা পেয়েছি। আমরা কখনও পশ্চাৎপদ হইনি। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমরা অগ্রসর হব। আমাদের বিজয় লাভ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের কাজ ক্রমশ এগিয়ে যাবে, পিছাবে না।"

বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। ১৯২৫ সালে যিনি সমস্ত হিন্দুকে সংগঠিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু কীভাবে? শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজ কীভাবে সংগঠিত হবে। হিন্দু সমাজে অগণিত ভেদ, বৈষম্য। এক সময় বলা হোত হিন্দু সংগঠন করা অসম্ভব। মানুষ ব্যঙ্গ করে বলত— একলা হিন্দু তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলে, আর একের বেশি হলেই আমার মত তোমার মত বলে ঝগড়া শুরু করে। চারজন হিন্দু তখনই এক জায়গায় হয় যখন পঞ্চমজন কাঁধের উপরে থাকে। এইরকম সময়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারজী ঘোষণা করেন, 'আমি মহান হিন্দু জাতির বংশোদ্ভূত, আমাদের মহান পরম্পরা আছে। এই দেশের গৌরবময় অতীতও আমরা গড়েছি। আজকের পরিস্থিতির জন্যও দায়ী আমরা। সুতরাং সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে দেশ নির্মাণের কাজ করতে হবে।" হিন্দু সমাজের অগণিত ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথা ধ্বংসের জন্য ডাক্তারজী সংঘর্ষের পথে যাননি। তিনি দ্বিতীয় পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন কোনো জাতিকে দোষ দিয়ে বা ছোট করে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে নতুন এক জাতি জন্ম হতে পারে। এজন্যই ডাক্তারজী দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ সংগঠন তৈরির রাস্তা গ্রহণ করেন। সমস্ত হিন্দুকে সংগঠিত করার পথ। টিকা-টিপ্পনি করে পরস্পরের ভুল খুঁজলে হবে না। হিন্দুত্বকে সামনে রাখলে জাতপাতের ভাবনা নিজেই হারিয়ে যাবে। ভারতরত্ন ড. ভীমরাও আম্বেদকরও বলতেন, হিন্দু সমাজে হাজার হাজার জাতি থাকা সত্ত্বেও সমস্ত জাতির মধ্যে একটি গভীর সাংস্কৃতিক একতা রয়েছে।

সঙ্ঘ সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাক্তারজী বলতেন, আমাদের কাজ সমস্ত হিন্দু সমাজের কাজ। এর কোনো অঙ্গকেই উপেক্ষা করা যাবে না। কার্যত উচ্চনীচ যে শ্রেণীর হিন্দুই হোক না কেন তার সঙ্গে আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কোনো হিন্দু ভাইকে নীচ মনে করে ঘৃণা করা পাপ। এমন সঙ্কুচিত মনোভাব অন্তত স্বয়ংসেবকদের মনে যেন না আসে। ...সমস্ত হিন্দুসমাজ আমাদের কার্যক্ষেত্র। নিজেদের মান-অপমান ক্ষুদ্র চিন্তা ছেড়ে ভালবাসা ও নম্রতার সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক ভাই-বোনের কাছে উপস্থিত হতে হবে।" ডাক্তারজীর সোচ্চার ঘোষণা— 'আমি হিন্দু, এ রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্র'। সংবিধান নির্মাতা বাবাসাহেব আম্বেদকরও লিখেছেন, 'হিন্দুরাষ্ট্র একটি সনাতন সত্য।' মহাতের চবদার পুকুর সত্যাগ্রহের সময় ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, 'সমতার শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক ভিত্তি' হলো সমস্ত প্রাণী পরমাত্মারই অংশ। ঈশ্বরের অংশ সমস্ত প্রাণীতে বর্তমান। এই হিন্দু ভাবধারাই সমতার অধিকারের জন্মদাতা। এরকম শ্রেষ্ঠ সমতার উদাহরণ বিশ্বে আর দুটি নেই।' ডাক্তারজী অস্পৃশ্যতা, শ্রেষ্ঠ ব্রাত্য, জাতি ভেদের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে এক সমরস হিন্দু সমাজ গঠনের সংকল্প নিয়েছিলেন। তিনি

জানতেন— পথ কণ্টকময় হতে পারে, কিন্তু আমাদের আচার-ব্যবহার এক, পরম্পরা এক, সংস্কৃতি এক। আমাদের বাহিরে যতই মতভেদ থাকুক না কেন আসলে সমস্ত হিন্দুই এক রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত। আমাদের ধমনীতে একই রক্ত বইছে। ফলে সমস্ত হিন্দুই সমান। ডাক্তার হেডগেওয়ার নিজের জীবনকালেই হিন্দু সংগঠনের বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রশিক্ষণ শিবিরের সমরসতার পরিবেশ গান্ধীজীকেও প্রভাবিত করেছিল।

বহু সমাজ বিজ্ঞানী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্রমবর্ধমান ধারা নিয়ে গবেষণা করছেন। কীভাবে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা রাষ্ট্রজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। একটা সংগঠন কীভাবে দীর্ঘ ৯২ বছর ধরে অটুট রয়েছে। সংগঠনের ইউএসপি-টাই বা কী? সমালোচকদের শত কুপ্রচার সত্ত্বেও কীভাবে ঝড়ের গতিতে সংগঠনের বিস্তার ঘটছে। তিন তিন বার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সরকার নিষিদ্ধ করলেও কেন সংগঠনের গতি থেমে যায়নি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। উত্তর খুব সহজেই পাওয়া যায়। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা বলতেন, 'সঙ্ঘের সিদ্ধান্তে অটল শ্রদ্ধা রাখো। সাহস ও আত্মবিশ্বাস সহকারে কাজ করো। আমরা স্বদেশ, স্বধর্ম ও নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষার জন্য কটিবদ্ধ হয়েছি। আমাদের প্রতিষ্ঠান সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিপদ অকারণে আসে না, এটা পরমাত্মার অসীম কৃপাই সূচিত করে। অগ্নি পরীক্ষায় আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি কি না তা দেখার জন্য এবং পরে ভবিষ্যতের পথ আমাদের দেখানোর জন্যই ভগবান আমাদের সামনে বিপদের অবতারণা করেন। অতএব এরূপ মনোভাব নিয়ে কাজ কর যে যেখানে বিপদের পর বিপদ যেখানে সঙ্ঘের কাজ আরও তীব্র গতিতে এগিয়ে যাবে।

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা অনুচর তৈরি করতে চাননি যেমনটা অন্য সংগঠন প্রণেতারা চায়। তিনি বলতেন, সঙ্ঘ কেবল বুদ্ধিহীন শিষ্যের সংখ্যা বাড়াতে চায় না। সঙ্ঘ চায় রাষ্ট্রনেতা নির্মাণ করতে। তোমাদের প্রত্যেককে যোগ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। তোমাদের কাছ সঙ্ঘের শুধু এইটুকুই আশা করে। সঙ্ঘের কার্যক্রম ছাড়া অন্যান্য সময় এমনভাবে ব্যয় করতে হবে যাতে তুমি ভালভাবে লেখাপড়া শিখে সঙ্ঘের কাজ করতে পার। ডাঃ হেডগেওয়ার এক পত্রে লিখেছেন, 'যে-কোনো রকম চাপ আসুক না কেন, নিজেদের উদ্দেশ্যকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে আমরা যেন সঙ্ঘকাজ বাড়াতে পারি। সঙ্ঘ কেবল সংগঠন করতে চায়। এছাড়া অন্য কোনো কাজে সঙ্ঘ করতে চায় না। একবার লোকে যদি বুঝতে পারে যে এই নীতিই সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক তাহলে আর কাজে কোনো অসুবিধা হবে না। আমাদের সাহচর্যে কিছুদিন থাকলেই এই কথা তাঁরা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন এবং সংগঠনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বাড়বে। কিন্তু এর জন্য অবিরত ঘাম ঝরাতে হবে।'

এটাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশেষত্ব। এই জন্য বিরোধীদের শত অপপ্রচার, চক্রান্ত, উৎপীড়নকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমস্ত হিন্দু সমাজকে এক সূত্রে বেঁধে ফেলার কাজ তীব্রতার সঙ্গে করে চলেছে আর বিরোধীরা শুধু গেরুয়া সন্ত্রাস বলে চিৎকার করে চলেছে।

হিন্দু রাষ্ট্র বাদাতীত সত্য

নিজের উগ্র স্বভাবের দরুন সশস্ত্র প্রতিকার ডাক্তারজী পছন্দ করতেন, তা সত্ত্বেও তার মূলে রাষ্ট্রভক্তিরই প্রেরণা থাকায় ইংরেজেরা বিদেশি, শত্রু ও শোষক হলেও শুধু তাদের বিরোধিতার চিন্তাই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, সেটা সম্ভব ছিল না। যে রাষ্ট্রের ভক্তি অন্তঃকরণে আছে সেটা কেমন, তার স্বরূপ কী, তার দৃশ্য রূপ কাদের কারণে তৈরি হয়েছে ইত্যাদি মূলগত প্রশ্নগুলি নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। প্রাচীনতমকাল থেকে যা ঘটেছে এবং চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ থেকে যা ঘটেছে এবং প্রত্যক্ষ চোখের সামনে ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ থেকে তাঁর এই ত্রিকালাবাধিত সত্যের সাক্ষাৎকার হয়েছিল যে 'হিন্দু জীবনই আমাদের পুণ্যভূমির রাষ্ট্রজীবন।' হয়তো বাল্যকালে তার অনুভূতি তিনি সপ্রমাণ, স্পষ্ট তথা অসন্দিগ্ধ রূপে ব্যক্ত করতে না পারলেও পরে এই উপলব্ধি তাঁর পূর্ণ রূপে হয়েছিল। তাঁর জীবিতকালে এবং আজও যে অনৈতিহাসিক ও অসত্য তথাকথিত মিশ্র রাষ্ট্রবাদের গুণগান করা হয়, সেটা বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে মেকি বা মিথ্যা এবং তা বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভাবনাকে আঘাত করে। এই মিথ্যা রাষ্ট্রবাদের কারণেই আপন ও পর, রাষ্ট্রীয় সমাজ ও তার শত্রু, বিদেশি আক্রমণকারী এবং তাদের আক্রমণের হাত থেকে স্বদেশ, নিজ সমাজ ও নিজ জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্ষা করার প্রয়াসে প্রাণ পণ করে সংগ্রামকারীদের মূল্যায়ন করার ব্যাপারে ক্ষমার অযোগ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের জাতি এই ভ্রম তথা অসত্যের ভূমিকা নিয়ে চলার জেদ ধরে থাকবে ততদিন তার উপর একের পর এক অমঙ্গল ঘনিয়ে আসতেই থাকবে। অপমানিত, নিরাপত্তাহীন এবং সংকটগ্রস্ত রাষ্ট্রজীবনের উত্তরোত্তর হ্রাস হতে-হতে অবশেষে হয়তো তার বিনাশের সময়ও এসে যেতে পারে, এইরকম দুঃখজনক প্রতীতি বিগত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের ঘটনাবলী থেকে হচ্ছে। যদি দলীয় স্বার্থের প্রতি অভিনিবেশ, দুরাগ্রহ এবং অন্য সমাজের ভয় মন থেকে দূর করে নিজেদের রাষ্ট্রজীবন সম্বন্ধে চিন্তা করা যায় তাহলে পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর পদচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হয়ে আমরা সকলে এ কথাই বলব যে, 'আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র আছে, পূর্বেও ছিল এবং আমাদের পরাক্রমের দ্বারা পরবর্তীকালেও চিরকালের জন্য তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় রাখতে হবে।" বস্তুত আমাদের রাষ্ট্রের বিষয়ে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ দাঁড় করিয়ে তাকে বিবাদের বিষয় বানিয়ে 'হিন্দু রাষ্ট্রবাদ' বলাটাও পরমপূজনীয় ডাক্তারজীর সুতীব্র অনুভূতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটা কোনো 'বাদ' হতে পারে না। হিন্দু রাষ্ট্র বাদাতীত সত্য।

—শ্রীগুরুজী

আন্তর্জাতিক নারীদিবসে মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রধানমন্ত্রীর উৎসাহ প্রদান

সুতপা বসাক ভড়

ভারতের জনগণ বারবার প্রমাণ করেছে যে, যখনই কোনো রাজনৈতিক দল বা নেতা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক লড়াই আরম্ভ করেন, তখন জাতি-ধর্মের বাঁধন ভেঙে তারা সেই দল বা নেতাকে অকুণ্ঠ সমর্থন করে। ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে কখনও যোগ হয় স্বৈরাচারিতা এবং অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা। সবদিক থেকে বিচার করলে আমরা দেখব যে, দেশের একতা-অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং তাঁর সরকার সমর্পিত। ফলস্বরূপ, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশে বিজেপি প্রচণ্ডভাবে জিতেছে। উত্তরপ্রদেশে জাতপাত, পরিবারকেন্দ্রিক,

মেকি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অপরাধকে সমর্থন করা দলগুলি ভোটে তার ফল পেয়েছে। যে নোটবন্দিকে কিছু দল দেশের জন্য বিপজ্জনক বলেছিল, আজ তাদের ওই অপপ্রচার তাদের পক্ষে আত্মঘাতী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ নোটবন্দিকে ভোটদাতারা ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওপর জনগণের এই বিশ্বাসের পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে। প্রায় তিন বছরের কার্যকালে তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ভ্রষ্টাচারের অভিযোগ কেউ করতে পারেনি। এমনকী, তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলীতেও ভ্রষ্টাচারের নামমাত্র চিহ্নও যে তিনি মেনে নেবেন না, তাও আমরা জানি। এখন সরকারের বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রকেও ভ্রষ্টাচারমুক্ত করার জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সেজন্য দেশের জনসাধারণ তাঁকে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করেন।

আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মোদী সরকার সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য আরও কিছু পদক্ষেপ নেবে। উত্তরপ্রদেশে বিজেপি জেতার পর বেনামি সম্পত্তির বিরুদ্ধে আইন তৈরি করার পথ আরও সুগম হবে। মহিলা সংরক্ষণের ব্যাপারেও এই সরকার সদর্থক পদক্ষেপ নিতে চলেছে। আসল কথা হলো, দেশের মানুষ সুশাসন চায়, আর এমন কোনো পদক্ষেপকে সমর্থন করতে পারে না, যা দেশের একতা এবং অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করবে। পূর্বতন উত্তরপ্রদেশ সরকারের নিদারুণ হারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখি সেই সরকারের মন্ত্রী গায়ত্রী প্রজাপতি (যার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আছে) পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিজেপি সরকার উত্তরপ্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণের আগেই এই পদক্ষেপ। মহিলাদের সঙ্গে অন্যায়ের প্রশ্রয় পাবে না জেনে আগেভাগেই গায়ত্রী প্রজাপতি আত্মসমর্পণ করেছে। এদিকে পুলিশও এখন ঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করেছে। কারণ মহিলাদের সম্মানের সঙ্গে এতদিন যা ছেলেখেলা হয়েছে, এখন তা হবে না, সেটা তারাও বুঝেছে। দুষ্কৃতীদের পক্ষে কেউ থাকবে না, তাদের জন্য কেবলমাত্র শাস্তি নির্ধারিত হবে।

অঙ্গনা

নারীর ক্ষমতায়ণের পথে অগ্রণী বর্তমান সরকার মহিলাদের আস্থা এবং সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বচ্ছ শক্তি-২০১৭ অনুষ্ঠানে সমগ্র দেশ থেকে আসা ৬০০০ মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান এবং সমাজের কল্যাণমূলক কাজে রত মহিলাদের সমাবেশে বক্তব্য রেখেছেন। তিনি মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের আরও বেশি করে সৃষ্টিশীল এবং পরিণামমূলক কাজ করার জন্য উৎসাহ দেন। তিনি এও বলেন যে, পুরুষ পঞ্চায়েত প্রধানের ধারণা এখন পুরনো হয়ে গেছে। একজন মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান সম্পূর্ণ গ্রামের পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরা পুরুষদের থেকে অনেক বেশি সমর্পণ ভাব নিয়ে কাজ করেন। শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, ভ্রূণহত্যা বিরোধী প্রচার, টীকাকরণ এবং অন্যান্য জনহিতকর যোজনাগুলি সার্থক করে তুলে মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানরা গ্রামগুলিকে এমন উন্নত করার ক্ষমতা রাখেন, যাতে গ্রামগুলির আত্মা থাকবে গ্রামীণ, কিন্তু সেখানে সুযোগ-সুবিধা থাকবে শহরের মতো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন, কিছু লোকের ধারণা ইংরেজিতে কথাবলা শহুরে লোকই কেবলমাত্র ভাল কাজ করতে পারে কিন্তু বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা মহিলাদের সফল জীবনকাহিনি লোকেদের মিথ্যা ধারণা ভেঙে দিয়েছে। মহিলাদের তিনি এও বলেন, গ্রামে মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান হিসেবে কাজ করা খুবই সম্মানজনক। তাঁদের অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সামাজিক বাধা-নিষেধের ওপরে উঠে কাজ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী গ্রামের জনপ্রতিনিধিদের অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন গ্রামের জন্মদিন পালন এবং ওই উপলক্ষ্যে গ্রামে দু-তিনদিন ধরে উৎসব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে গ্রামের মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের গ্রামোন্নয়নের জন্য পথনির্দেশ দিয়ে তাঁদের সম্মান জানান দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর এই উদ্যোগ অবশ্যই গ্রামের তথা সমগ্র দেশের জনগণকে উন্নয়নের পথে আরও গতিশীল করবে। ■

ভিটামিন সমৃদ্ধ পুদিনাপাতা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

প্রচণ্ড পরিশ্রমে যখন ক্লান্তিতে নাজেহাল মানুষ। শক্তি হারায় কাজ করার। নেমে আসে অবসাদ। শরীর জুড়ে এই ক্লান্তি আর অবসাদ থেকে কিছু শক্তি এনে দিতে পারে পুদিনাপাতা। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হিসেবে আমরা তাকে পুদিনা নামে চিনি। তাই পুদিনাপাতা কারও কাছেই অজানা নয়। বিশেষ করে, স্যালাডের প্লেটে স্বমহিমায় এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায় যেমন, তেমনই পুদিনাপাতা দিয়ে তৈরি সরবত গরমে ক্লান্তি দূর করে।

সর্দিজ্বরে পুদিনা : সর্দিজ্বরে পুদিনাপাতা ও গোলমরিচ ফুটিয়ে চায়ের মতো দিনে ৩ বার পান করলে উপকার পাওয়া যায়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পুদিনাপাতা : কয়েকটি পুদিপাতা সকাল-সন্ধ্যায় চিবালে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়।

ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে পুদিনা : ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য ১ চামচ পুদিনাপাতা বাটার সঙ্গে ২ চামচ টকদই ফেটিয়ে ১৫ মিনিট ধরে গায়ে মাখতে হবে।

স্বরভঙ্গে পুদিনাপাতা : গলার স্বর ভেঙ্গে গেলে লবণ-সহ পুদিনাপাতা ফুটিয়ে গার্গল করতে হবে।

বলতে গেলে, ‘অ্যান্টি অক্সিডেন্ট’ ও ‘ভিটামিন’ সমৃদ্ধ এই পুদিনা পাতা বহুগুণের অধিকারী। পুদিনাপাতায় যেমন অ্যান্টি অক্সিডেন্ট নামে এমন এক উপকরণ আছে, যা গরমে ঘাম জমে ঠাণ্ডা লাগা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। আবার অন্যদিকে, বয়সের ভারে ত্বকেরও যে বয়স বাড়ে, তা থেকেও রক্ষা করে। চুলকে করে তোলে তরুণ।

শুধু ছোটরা কেন, বড়দেরও যখন ফুড পয়জনিংয়ের সমস্যা দেখা দেয়, তখন বাজার-চলতি ওষুধ খাবার আগে বা চিকিৎসকের কাছে পৌঁছনোর আগে পুদিনাপাতার রস জল সহযোগে খেলে তাৎক্ষণিক পেটের ভিতরে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তা কমিয়ে আনে। কষ্ট থেকে স্বস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রেও পুদিনাপাতার জুড়ি মেলা ভার। গরমে অতিরিক্ত শুষ্কতার জন্য বাতাসে ভেসে আসা জীবাণু অঢাকা খাবারে বংশ বিস্তার করে। এক্ষেত্রে পুদিনাপাতার তুলনা নেই। আবার গরমে ‘ঠাণ্ডা-গরম’ যাদের লেগে থাকে, তাদের জন্য পুদিনাপাতা দারুণ কাজে দেয়। এক্ষেত্রে পুদিনাপাতা, তুলসীপাতা ও কাঁচা আদা একত্রে বেটে রস বের করে মধু সহযোগে খেলে ঠাণ্ডা লাগা থেকে দ্রুত আরোগ্য লাভ করা যায়। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, অনেকে তরকারিতে পুদিনাপাতা দিয়ে থাকেন। এটা ঠিক নয়, কেননা পুদিনাপাতার পুষ্টিগুণ এতে নষ্ট হয়ে যায়। পুদিনাপাতা রান্নার থেকে কাঁচা খাওয়াই উত্তম। এতে পুষ্টিগুণ বজায় থাকে এবং দেহের ক্ষতিকর জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে। বহু গুণের অধিকারী পুদিনাপাতা তাই সবসময়েই সমাদৃত।

রোগ নিরাময়ে কাঁচাকলা

একটি কাঁচাকলা খোসা সমেত চাকা চাকা করে কেটে প্রতি রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে জল খেলে কঠিন আমাশয় রোগ নির্মূল হয়। এইভাবে ১ মাস খেতে হবে।

পেটের অসুখে, আমাশয় ও রক্ত আমাশয় রোগে কাঁচাকলা সেদ্ধ করে টাটকা টক দইয়ের সঙ্গে মেখে খেলে রোগ সারবে।

কলাগাছের শুকনো শেকড় গুঁড়ো করে অল্প পরিমাণে খেলে পিত্ত রোগ সারে। রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগেরও এটি একটি মহৌষধ।

অনেকের মতে, কলাগাছের শেকড়ের রসের সঙ্গে ঘি ও চিনি মিশিয়ে খেলে যৌন ব্যাধি সারে ও প্রস্রাবের অসুখ সারে।

একেবারে কচি কলাপাতা মিহি করে বেটে দুধ মিশিয়ে ঘন ক্ষীরের মতো করে খাওয়ালে মেয়েদের প্রদর রোগে উপকার হয়। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

মিজোরামের তাঁতশিল্পী লালফাক জুয়ালি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভোরবেলায় যখন সূর্যের গেরুয়া আলোয় ভেসে যায় আশপাশের পাহাড় এবং উপত্যকাগুলি, তখন তার ঘুম ভাঙে। দ্রুত হাতে ছেলেকে স্নান করিয়ে, তাকে তার দাদুর জিম্মায় দিয়ে আসার পর শুরু হয়ে যায় তার দিন। কর্মব্যস্ত দিন। বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করে তিনি তাঁতে বসে পড়েন। শোনা যায় মাকুর একটানা শব্দ। সাহায্য করেন তাঁর মা আর বোনেরা।

বোনার কাজে ব্যস্ত লালফাক জুয়ালি।

তাঁর নাম লালফাক জুয়ালি। মিজোরামের তন্তুবায় সম্প্রদায়ের এক উজ্জ্বল মুখ। তাকে আজ মিজোরাম তো বটেই, ভারতবর্ষও চেনে। কারণ গ্রামেগঞ্জে পুরুষরচিত ঘেরাটোপ ভেঙে বেরিয়ে আসার যে লড়াই ভারতীয় মহিলারা শুরু করেছেন লালফাকও তার একজন অংশীদার।

যদিও কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর লালফাক বাবার কাছে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাবা তন্তুবায়। স্বাভাবিক ভাবেই বয়ন হয়ে উঠেছিল মেয়েরও পেশা। তারপর ধীরে ধীরে কাজ শেখা। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তাড়নায় বাধার পাহাড় ঠেলে হয়ে উঠলেন তাঁতশিল্পী। লালফাক সাধারণত শাল (মিজো ভাষায় পুয়ান) এবং মেয়েদের স্কার্ট তৈরি করেন। একটি শাল বুনতে সময় লাগে এক সপ্তাহ। বাজারে বিক্রি হয় তিন হাজার টাকায়। এইভাবে লালফাক তার বাবা-মা, চার বোন আর ছেলের জীবনধারণের ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই সামান্য রোজগারে এতগুলো মানুষকে ভালো রাখা তো অনেক দূরের ব্যাপার, ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটে না। তাছাড়া ছেলের ভবিষ্যৎ আছে। কয়েকবছর আগে তাই লালফাক কতকটা হন্যে হয়েই বলেছিলেন, 'আমাদের আরও একটা তাঁত কেনা দরকার।' আঁতকে উঠেছিলেন বাকি চার বোন। এটা কীভাবে সম্ভব! টাকা কোথায়? কিন্তু লালফাক কোনো কথা শুনতে রাজি নন। তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং কাজের উৎকর্ষ বিচার করে টাকা ধার দিলেন মিলাপের মহাজনেরা। ক্রমশ লালফাকের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠল।

এখন লালফাক পাঁচটি তাঁতের মালিক। অতিরিক্ত চারজন কর্মীকে রাখতে হয়েছে। তার রোজগার বেড়েছে। সাত বছরের ছেলে স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

মিজোরামের বয়নশিল্পের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা অনেকেই বলেন, লালফাকের সাফল্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বস্তুত গত কয়েক বছরে সমগ্র মিজোরামে মহিলাদের কর্মোদ্যগের যে জোয়ার এসেছে লালফাক জুয়ালি তারই ফসল। মিজো মহিলাদের একটা বড় অংশ ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাড়ির কাজকর্ম সেরে যে-যার পেশাগত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে বয়নশিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ভারতের মোট ২৭.৪৩ লক্ষ মহিলা তাঁত বোনার কাজ করেন। এদের ৭৭ শতাংশই গ্রামের বাসিন্দা।

লালফাক যখন বোনার কাজ শুরু করেন তখন তাঁর পরিবারে অসহনীয় দারিদ্র্য। এখন তিনি নিজে তো বটেই, তাঁর পরিবারও শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়ে। প্রশংসা করলে লাজুক হাসেন। অস্পষ্ট গলায় বলেন, 'মেয়েদের সুযোগ দিলে বোনার কাজ তাদের খুব ভালো পেশা হতে পারে।'

আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে সেরা রেফারি হয়েছি : সুধীন চ্যাটার্জী

আশি বছরে পৌঁছেও তিনি সমান সক্রিয় ও সপ্রতিভ। এখনো দেশ-বিদেশের সমস্ত খেলা দেখেন ও বিশেষজ্ঞের মতামত দেন গণমাধ্যমে। তিনি প্রাক্তন ফিফা রেফারি ও হকি আম্পায়ার সুধীন চ্যাটার্জী। খেলা পরিচালনায় আসার আগে ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি খেলেছেন কলকাতা ময়দানে বড় ক্লাবে। ভারত বিখ্যাত মামার যোগ্য উত্তরসূরী ভাগ্নে সুধীন চ্যাটার্জি সব অর্থেই ক্রীড়া ও শরীরচর্চা বেত্তা পুরুষ। এবারে স্বস্তিকায় তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

□ আপনি রেফারি হলেন কীভাবে ও কেন?

□ আমার মামা প্রয়াত সন্তোষ গাঙ্গুলির নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তিনি ভারতের তিনটি প্রধান খেলার (ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট) এক দক্ষ সংগঠক এবং পরিচালক ছিলেন। তিনিই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমি নিজে রেফারিংয়ে আসার আগে হকি আম্পায়ারিং শুরু করেছি। বেটন কাপ, আগাখান গোল্ড কাপ-সহ একাধিক জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্ট খেলিয়েছি। কিন্তু আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলাবার সুযোগ পাইনি রাজনীতির শিকার হয়ে। তাই নিজেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে মেলে ধরার অভিলাষ নিয়ে চলে এলাম ফুটবল রেফারিংয়ে। আর বলতে গেলে ফুটবলই আমার স্বপ্ন পূরণ করেছে।

□ কলকাতা লিগে আপনার খেলানো প্রথম ম্যাচ কোনটা? সন্তোষ ট্রফি ও ফিফা ব্যাচ কবে পেলেন?

□ ১৯৭০ সালে মহামেডান উয়াড়ি ম্যাচ দিয়ে আমার অভিষেক। সন্তোষ ট্রফি প্রথম খেলাই ১৯৭৯-য়ে তামিলনাড়ুর কোয়েমবাটুরে। প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ ১৯৮০-র কুয়েতের এশিয়ান কাপে।

□ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেরা ম্যাচ পরিচালনা কোনটি?

□ ১৯৭৯-এর সন্তোষ ট্রফিতে গোয়া-পঞ্জাব ম্যাচটি জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে স্মরণীয় ম্যাচ। প্রচণ্ড উত্তেজনাপূর্ণ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচে সব সময় ম্যাচের রাশ নিয়ন্ত্রণে রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে শেষ করেছিলাম। কুয়েতে এশিয়ান কাপে ইরাক-ইরান ম্যাচটি হয়েছিল আগাগোড়া লড়াকু মেজাজে। কারণ তখন দু'দেশের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। টেনশন ও উত্তেজনার বারুদ ঠাসা ম্যাচে দু'দেশের খেলোয়াড় কোচ, কর্তাদের আবেগ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাধ্য করেছিলাম। ম্যাচটি সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ইরাকের সর্বময় কর্তা উদয় হোসেন (সাদ্দাম হোসেনের ভাই) বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। এছাড়া ১৯৮২-তে কলকাতা নেহরু গোল্ডকাপ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে লুই রোসা, ইভান নেত্রাভিচের মতো বিশ্বখ্যাত রেফারিদের সরিয়ে সেরা রেফারির পুরস্কার পেয়েছিলাম ফেডারেশনের কাছ থেকে। এর পর ৮৩-র নেহরু কাপে ক্যামেরুন, হাঙ্গেরি ম্যাচটি অত্যন্ত রাফ অ্যান্ড টাফ হয়েছিল। ভগবানের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে ম্যাচটি নির্বিঘ্নে শেষ করতে পেরেছিলাম। না হলে মাঠে রীতিমতো সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

□ মোট কতবার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলিয়েছেন?

□ দেশে ও বিদেশে গোটা কুড়ি আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনার সুযোগ পেয়েছি। এশীয় পর্যায়ে মারডেকা এশিয়ান কাপ ও তার থেকে বড় আন্তর্জাতিক মঞ্চ নেহরু কাপ— এই তিনটি মেজর ফিফা টুর্নামেন্টে প্রায় প্রতিটি ম্যাচই বিতর্কশূন্য ভাবে খেলিয়েছি। ১৯৮২-এর মারডেকায় মালয়েশিয়া ও ব্রাজিলের সাওপাওলের মধ্যে ম্যাচটি এক অর্থে স্মরণীয়। ওই ম্যাচটি ছিল মালয়েশিয়া অধিনায়কের শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এক আবেগঘন, রোম্যান্টিক পরিবেশের মধ্যে ম্যাচটি হয়েছিল। খেলার পর মালয়েশিয়ার রাজা মাঠে নেমে এসে হাত মিলিয়ে যান।

□ ১৯৭৮ ও ১৯৮০ সালের লিগে বহু বিতর্কিত বড় ম্যাচ দুটির কথা যদি বলেন?

□ ৭৮-র লিগের বড় ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের সব তারকা ফুটবলার এক জ্যোতিষীর পরামর্শ মেনে আগে মাঠে নামতে চায়নি। যে দল আগে নামবে সে দল হারবে এই ছিল তাঁর ভবিষ্যতবাণী। আধঘণ্টা অপেক্ষার পর বাধ্য হয়ে দু'দলের অধিনায়ক সুরজিৎ সেনগুপ্ত ও প্রসূন ব্যানার্জির সঙ্গে কথা বলে একসঙ্গে দু'দলকে মাঠে নামাই। দর্শকরা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ম্যাচ না হলে দু'দলের সমর্থকদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যেত। খেলাটি পুরো নিয়ন্ত্রণে রেখে শেষ করেছিলাম। আর ১৯৮০-র লিগের বড় ম্যাচটি কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় কলঙ্কিত অধ্যায়। বিদেশ বসু-দিলীপ পালিত পরস্পরের মধ্যে মারামারি করে গ্যালারিতে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। দু'দলের খেলোয়াড়রা পরস্পরের মধ্যে মারামারি করে পরিবেশ বিষিয়ে দিয়েছিল। অত দর্শকের প্রাণ চলে গেল, আমি কিছু করতে পারলাম না। একথা ভাবলে এখনো রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে যায়। গোটা রেফারিং ও আম্পায়ারিং কেরিয়ারে প্রতিটি ম্যাচ সুনাম ও দক্ষতার সঙ্গে খেলিয়ে দেশের সেরা ফিফা রেফারির ব্যাচ পেয়েছি। কেবল ওই একটি ম্যাচই আমার জীবনের 'ব্ল্যাকস্পট'।

নবাঙ্কুর

আইনস্টাইনের খেয়ালিপনা

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ছিলেন একজন আপনভোলা খেয়ালি মানুষ। তাঁর এই খেয়ালি কাণ্ডকারখানার কথা শুনলে বিশ্বাসই হবে না যে এতবড় একজন বিজ্ঞানী এরকম হতে পারে। তিনি এমনই একটি ঘটনা ঘটিয়েছেন তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে। আইনস্টাইনের তখন অনেক নামডাক। নানা জায়াগায় তাঁকে বক্তৃতা করতে যেতে হয়। ড্রাইভার তাঁকে গাড়িতে করে সেখানে নিয়ে যায়। আইনস্টাইনের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ড্রাইভারের প্রায় সবই মুখস্থ হয়ে গেছে। একদিন সে আইনস্টাইনকে বলল— স্যার, আপনি তো ঘুরে ফিরে একেই কথা বলেন। শুনতে শুনতে আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন আমিও আপনার কথাগুলো বলতে পারবো।

আইনস্টাইন শুনে খুব মজা পেলেন। বললেন, ঠিক আছে, আগামীকাল আমার যেখানে বক্তৃতা করার কথা আছে সেখানে আমাকে কেউ চেনে না। ওখানে আমার হয়ে তুমিই বক্তৃতা দিও।

পরের দিন ড্রাইভার বক্তৃতা দিচ্ছে। আইনস্টাইন পেছনে দর্শকের আসনে বসে শুনছেন। ড্রাইভার ভালোই বক্তৃতা দিল। বক্তৃতা শেষে মঞ্চ থেকে নেমে আসতেই এক অধ্যাপক এগিয়ে এসে বললেন— ধন্যবাদ, আজকে আপনার বক্তৃতা শুনে অনেক কিছু জানলাম। কিন্তু একটি জায়গায় ঠিক বুঝতে পারছি না। দয়া করে যদি বুঝিয়ে দেন।

ড্রাইভার এবার পড়লো মহা বিপদে। কিন্তু সে বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে পিছনের সারিতে বসে থাকা আইনস্টাইনকে দেখিয়ে দিয়ে বলল— এতো খুবই সহজ একটি বিষয়। আপনি আমার ড্রাইভারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন সে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

এরকম ঘটনা ছাড়াও আইনস্টাইনের আরো একটি মজার ব্যাপার হলো তাঁর ভুলে যাওয়া। সাধারণ বিষয় তিনি বেমালুম ভুলে যেতেন। একবার আমেরিকার একটি বড় বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে থাকার জন্য তাঁকে একটি বাড়ি দেওয়া হয়েছিল। একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা সেই শিক্ষাকেন্দ্রের ডিনের কাছে ফোন এলো। ডিনের সেক্রেটারি ফোন ধরতেই এক ভদ্রলোক আইনস্টাইনের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইলেন। সেক্রেটারি বিনয়ের সঙ্গে বললেন— দুঃখিত, আইনস্টাইন নিরিবিলিতে থাকতে চান। তাঁর ঠিকানা দেওয়া নিষেধ। তখন ফোনের অপর প্রান্ত থেকে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে জবাব এলো— আমিই আইনস্টাইন। বিকেলে একটু বেরিয়েছি। এখন বাড়ির ঠিকানাটা মনে করতে পারছি না। প্লিজ, বলুন ঠিকানাটা।

ঠিকানা নিয়ে এমন আরো একটি ঘটনা। আইনস্টাইন একবার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বাসে করে ফিরছেন হোটেলে। বাসের কন্ডাক্টর এসে টিকিট চাইলো। আইনস্টাইন খুবই বিব্রত বোধ করলেন। এ পকেট সে পকেট হাতড়ে কোথাও টিকিট পেলেন না।

কন্ডাক্টর তাঁকে এরকম বিব্রত হতে দেখে বলল— ঠিক আছে, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। টিকিটটা কোথাও পড়ে গেছে হয়তো।

একথা শুনে আইনস্টাইন বিচলিত হয়ে বললেন— আরে না না, কী বলছ তুমি! টিকিট না পেলে আমি হোটেলে ফিরবো কী করে? টিকিটের উল্টো পিঠে যে হোটেলের নাম লেখা রয়েছে।

একবার কোথাও যাওয়ার সময় ট্রামের কন্ডাক্টর কয়েকটি পেনি ফেরত দিল। আইনস্টাইন গুনে দেখলেন দু'পেনি বেশি। তিনি কন্ডাক্টরকে বলায় কন্ডাক্টর গুনে দেখিয়ে দিল ঠিক আছে। আইনস্টাইন গুনে দেখলেন এবার দু'পেনি কম। কন্ডাক্টর বিরক্ত হয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে বললে আপনি তো বিজ্ঞানী! আইনস্টাইন বিনয়ের সঙ্গে বললেন— ম্যান সে সো।

ভারতের পথে পথে

ঘৃষ্ণেশ্বর

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হলো ঘৃষ্ণেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ। মহারাষ্ট্রের দেবগিরি (ঔরাঙ্গাবাদ) থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে ইলোরা গুহার কাছে এটি অবস্থিত। কথিত আছে বেরুলের বনবাসীরা ঘৃষ্ণেশ্বরের কৃপায় এখানে গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিল। সেই সম্পদ দিয়ে নির্মাণ হয় এই মন্দির। বর্তমানে যে মন্দিরটি রয়েছে সেটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। লাল পাথরে নির্মিত এই মন্দির গাত্রে দেবদেবীর চিত্র খোদাই করা। ঘৃষ্ণেশ্বরের মূল মন্দিরটি ইসলামি আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তারপর রানি অহল্যাবাঈ হোলকার মন্দিরটির নবনির্মাণ করান। সেই সময়েই মন্দিরের চারিদিকে সুন্দর প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। গর্ভগৃহটির আয়তন দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৭ ফুট। ঘৃষ্ণেশ্বর থেকে আধ কিলোমিটার দূরেই ইলোরা গুহা।

এসো সংস্কৃত শিখি

गम्भीरः मा भवतु।

এতো গম্ভীর হবেন না।

युक्ते समये आगतवान्।

ঠিক সময়ে এসেছেন।

बहु जल्पति भोः

খুব বেশি কথা বলছেন হে।

एषा केवलं किंवदन्ती।

এ তো কেবল উড়ো খবর।

किमपि न भवति।

কিছুই হবে না।

ভালো কথা

পায়রা আমার বন্ধু হলো

চড়ুই পাখি বেশি দেখা যায় না। তবে আমাদের বাড়িতে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রা আসে। উঠোনে ছাদে যেখানে সেখানে উড়ে বেড়ায়। পায়রার বকম বকম ডাক শুনলেই আমার মামা বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়। কারণ আমার মামা বাড়িতেও অনেক পায়রা আছে। আজকাল তাই আমাদের বাড়িতে পায়রা আসাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। একদিন সকালবেলা বারান্দায় বসে আমি মুড়ি খাচ্ছিলাম, একটি পায়রা আমার সামনে চলে এলো। কয়েকটা মুড়ি খেতে দিলাম। তা দেখে একটি দুটি করে পাঁচটি পায়রা চলে এলো। আমি আরো মুড়ি দিলাম। এখন আমি খেতে বসলেই পায়রাগুলি চলে আসে। আমি তাদের খেতে দিই। আমার হাতে মাথায় ওরা বসে। আমার হাত থেকে মুড়ি খেয়ে যায়।

তমালিকা দাস, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

স্বার্থপরের হানাহানি

আকাশ কর্মকার, নবম শ্রেণী

খবরের কাগজে টেলিভিশনে
খবর কেবল মারামারি
একে মারে তাকে মারে
খুনের বদলে খুন করে,
অবাক হয়ে ভাবি আমি
স্বার্থগুলো এতোই দামি।

থাকতে ভালো সবাই বলে
কাজের বেলা উল্টো করে,
মা বাবাকে কষ্ট দিয়ে
নিজের কথাই শুধু ভাবে,
স্বার্থে আঘাত লাগলে পরে
নিজের ভাইকেও পিটিয়ে মারে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - 7059591955
E-mail : swastika5915@gmail.com
মেল করা যেতে পারে।

শব্দরূপ-৮২৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** মনের অবস্থা, প্রকৃতি, **৩.** বিড়াল, **৫.** গ্রীষ্মকাল, **৬.** অতি কাঁচা, সদ্যোজাত, **৮.** শক্তি, সামর্থ্য, **১০.** ‘‘বনে থাকে—, গাছে থাকে পাখি’’, **১২.** হালুয়া, **১৪.** পৃথিবীপতি, সম্রাট আকবরের পৌত্র, **১৬.** বাঁধন, ছুটি, **১৭.** শেষ, **১৯.** বল্লরী, **২১.** অবিবাহিত কন্যার গর্ভজাত, **২২.** তরঙ্গ, **২৩.** চোগা জাতীয় বড় ও ঢিলা জামা।

উপর-নীচ : **১.** মুখে কালো কালো দাগ, **২.** জাত, সম্ভূত, **৩.** ইন্দ্র, **৪.** ঘরের সামনের পাকা দালান, **৭.** প্রদীপ, **৯.** বিবাদ, ঝগড়া, **১১.** গাঢ়, মেঘ, **১২.** অজ্ঞানতাজনিত ভ্রান্তি, **১৩.** দুঃখবোধ, **১৪.** শিমুলগাছ, **১৫.** গোরুর খাবার কাটা খড় ইত্যাদি, **১৭.** ‘‘আছ—অনিলে চিরনভনীলে’’, **১৮.** পশমী শীতবস্ত্র, **২০.** ‘‘—গাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে’’।

সমাধান
শব্দরূপ-৮২৬

ঈ	■	■	এ	গু	নী	মা	■
শা	■	■	র	■	বা	■	■
নী	হা	রি	কা	■	র	বা	র
■	ল	■	■	■	■	সু	■
■	খা	■	■	■	■	দে	■
বা	তা	বি	■	বি	ভা	ব	সু
■	■	জু	■	জ	■	■	প
■	গৌ	রী	দা	ন	■	■	র্ণ

সঠিক উত্তরদাতা

সঞ্জয় পাল
সাহাপুর, মালদা
পার্থ সেন
ঝালদা, পুরুলিয়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

- ৮২৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১ মে ২০১৭ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। ‘চিঠিপত্র’ **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু’টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ২৮

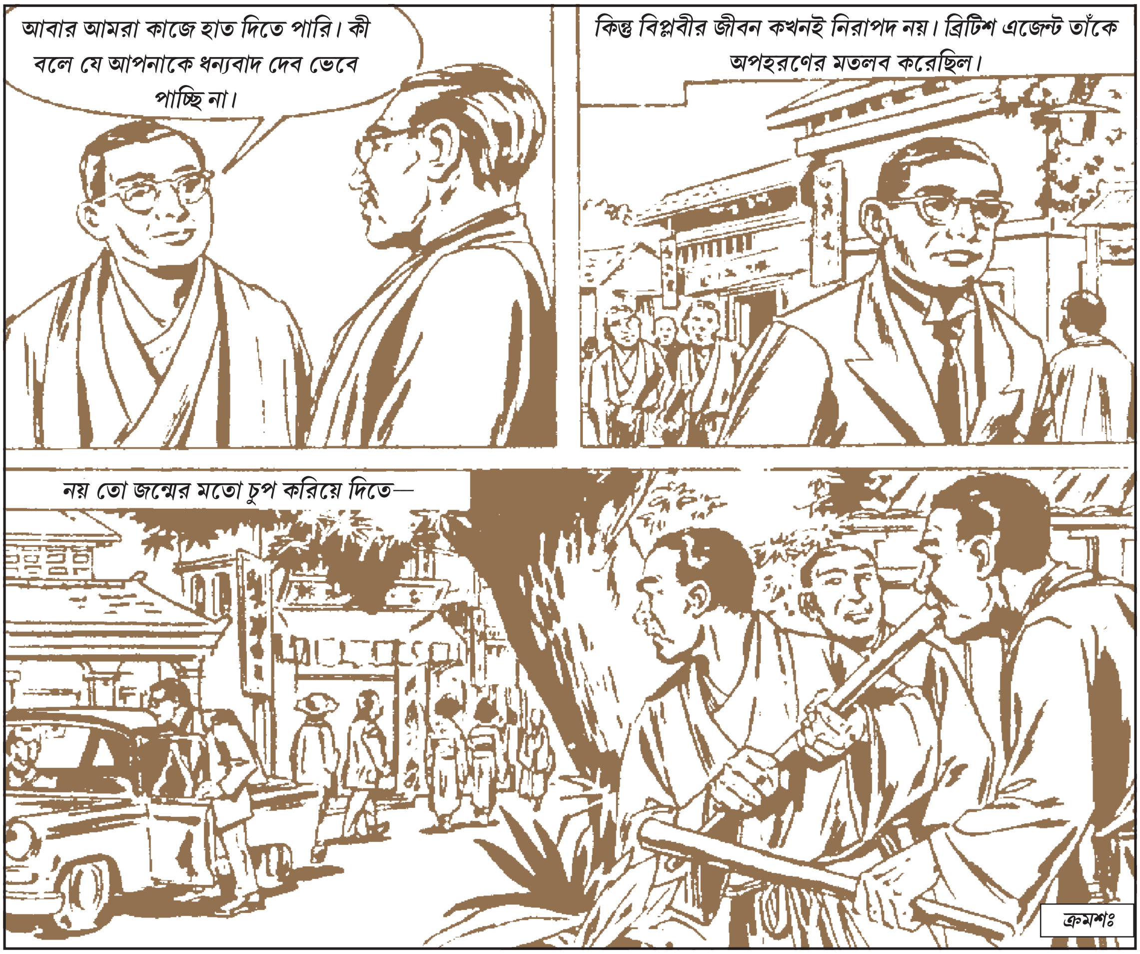

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬, দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

ভারতের ভোট-মেশিন সব থেকে সেরা : নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভোটে হেরে যাবার পর থেকেই মায়াবতী 'মেশিনে কারচুপি করা হয়েছে' বলে মুখরক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। তার সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে ভারতে যে ইভিএম (ভোট-মেশিন) ব্যবহার করা হয় তা সারা পৃথিবীতে সব থেকে সেরা। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচনে ব্যবহৃত ইভিএমের গুণমান নিয়ে কমিশনের কোনো সন্দেহ নেই। ইভিএমের বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে অভিযোগ উঠেছে তা এক কথায় ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশ্বের বহু দেশে উপগ্রহ-নিয়ন্ত্রিত ইভিএম ব্যবহার করা হয়। তাতে হ্যাকিং-এর সম্ভাবনা থাকে। ভারতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তা ব্যাটারি-চালিত। সব ধরনের ঝামেলা থেকে মুক্ত। সেই সূত্রেই কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'ভারতে সব থেকে সেরা ইভিএম ব্যবহার করা হয়।'

গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামজ্যোতি যোজনার আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ১২,৬৬১টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। সম্প্রতি লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শক্তিমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এই তথ্যটি দিয়েছেন। ২০১৫ সালে সারাদেশে বিদ্যুৎহীন গ্রাম ছিল ১৮,৪৫১টি। মন্ত্রী জানিয়েছেন বাকি গ্রামগুলিতে যত শীঘ্রসম্ভব বৈদ্যুতিকরণের কাজ শেষ করা হবে।

অবৈধ কসাইখানাই শুধু বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যোগী আদিত্যনাথ কথা রেখেছেন। বিজেপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় এলে যেসব কসাইখানার বৈধ লাইসেন্স নেই সেগুলি তারা বন্ধ করে দেবে। বন্ধ করা হবে অবৈধ রেস্টুরেন্টও। রাজ্য সরকার তল্লাশি অভিযান শুরু করতে বিপদে পড়েছে বেশ কয়েকটি কসাইখানা এবং রেস্টুরেন্ট। বৈধ লাইসেন্স না থাকার কারণে বিখ্যাত তুন্ডে কাবাব রেস্তোরাঁ তাদের গালাওয়াটি কাবাব বন্ধ করে দিয়েছে। এতদিন লাইসেন্স ছাড়াই মোষের মাংস কেনাবেচা করত রেস্তোরাঁটি। মোষের মাংস ছাড়া গালাওয়াটি হয় না। একই অবস্থা রহিমসেরও। তারা এখন নাহারি বানাচ্ছে মুরগির মাংসে। মোষ বন্ধ। সস্তা বলে এতদিন লাইসেন্সের তোয়াক্কা না করে লক্ষ লক্ষ মোষ উত্তরপ্রদেশে মারা পড়ত। যোগী আদিত্যনাথের কড়া মনোভাবে এখন প্রমাদ গুনছেন অসাধু ব্যবসায়ীরা।

সৌরশক্তিতে চলবে রেল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতীয় রেল বিদ্যুতের পরিবর্তে সৌরশক্তিতে ট্রেন চালাবে। এর ফলে রেলের সাশ্রয় হবে বছরে ৪১,০০০ কোটি টাকা। সম্প্রতি রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু 'মিশন ৪১কে' প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ৪১,০০০ কোটি টাকা বাঁচানোর লক্ষ্যে গৃহীত বলেই প্রকল্পটির এরকম নাম। সুরেশ প্রভু বলেন, 'আমরা খরচ বাঁচানোর সঙ্গে রাজস্ব উপার্জন বৃদ্ধির কথাও ভাবছি।' তাঁর দাবি, বিদ্যুৎ খরচ বাবদ ৪০০০ কোটি টাকা এখনই সাশ্রয় হচ্ছে। তবে ৪১০০০ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে হলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ১০০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সৌরবিদ্যুৎ ছাড়াও ভারত এখন ২৫ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ তৈরি করতে পারে। এছাড়া চলছে বর্জ্য পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ। আরও বেশি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে রেলের বাড়িগুলির ছাদে প্যানেল বসানোর কাজ শীগগির শুরু হয়ে যাবে।

রামসেতু : ইতিহাস গবেষণা পর্ষদের তথ্যানুসন্ধান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রামসেতু কি প্রকৃতির তৈরি, নাকি মানুষের নির্মাণ— প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণাদি-সহ এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য প্রত্নগবেষক এবং ইতিহাসবিদদের

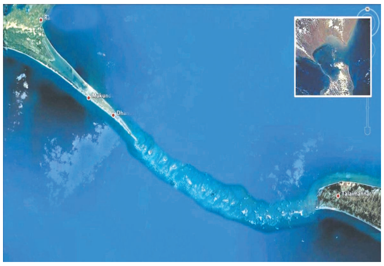

একটি দল সমুদ্রের নীচে অনুসন্ধান চালাবেন। রামসেতু পাইলট প্রকল্পের অধীন এই কর্মসূচি পরিচালনা করবে ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা পর্ষদ (আই সি এইচ আর)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামসেতু তামিলনাড়ুর উপকূল থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত পামবান দ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার মানার দ্বীপের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী একটি সেতু। এই সেতু সম্পর্কে নানা মত প্রচলিত রয়েছে। ২০০২ সালে উপগ্রহের তোলা ছবির তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে নাসা জানিয়েছিল— রামসেতু মানুষের তৈরি। কার্বনডেটিং পরীক্ষায় এই সেতুর যে সময়কাল নির্ণীত হয়েছে তাও রামায়ণের সময়কে চিহ্নিত করে। কিন্তু প্রত্নগবেষকেরা আরও অকাট্য প্রমাণ চান। সেইজন্যেই নতুন করে এই তথ্যানুসন্ধানের উদ্যোগ।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
3 April - 2017 - Rs. 10.00,

नमामि देवि नर्मदे

नर्मदा सेवा यात्रा

एक अनूठा अवसर माँ नर्मदा की
सेवा में आपके योगदान का

नर्मदा सेवकों का ऑनलाइन पंजीयन

मध्यप्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली में जीवनदायिनी नर्मदा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। नर्मदा में निर्मल जल का प्रवाह अविरल बना रहे, यह हम सबका पुनीत कर्तव्य है।

नर्मदा को प्रदूषण मुक्त कर इसके दोनों तटों पर सघन वृक्षारोपण द्वारा नर्मदा सेवा का विशाल अभियान 'नमामि देवि नर्मदे–नर्मदा सेवा यात्रा' चलाया गया है ।

आइये, अधिक से अधिक संख्या में नर्मदा सेवक के रूप में ऑनलाइन पंजीयन कराकर आप भी अभियान से जुड़कर अपना योगदान करें।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

नर्मदा सेवक बनने के लिए आप वेबसाइट
http://www.namamidevinarmade.mp.gov.in/narmadasevak.aspx
पर अपना पंजीयन कर सकते हैं।

म.प्र. जन अभियान परिषद्
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

Follow Chief Minister Madhya Pradesh /CMMadhyaPradesh /CMMadhyaPradesh /ChouhanShivrajSingh

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2017

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।